অস্তিবাদ গণতন্ত্র ও মার্কস্‌বাদ

সন্তোষ ঘোষ

রত্নাবলী / ৫৯এ, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৩৬৯

প্রকাশক
সুমন চট্টোপাধ্যায়
রত্নাবলী
৫৯এ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
সিদ্ধার্থ হোম

কলেজস্ট্রীটে প্রাপ্তিস্থান
পুস্তক বিপণি
৫৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রণে
স্টার এন্টারপ্রাইজ
৫৯এ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

আমার একান্ত শুভার্থী
ড. মৃণাল কান্তি ভদ্র-কে

জাঁ-পল সার্ত্র্ : জীবন ও দর্শন
অস্তিবাদ : দর্শনে ও সাহিত্যে
আদিউ, বিদায় সার্ত্র্

নিবেদন

এক যুগেরও বেশী সময় ধরে অস্তিবাদকে জানার ও বোঝার চেষ্টা করে চলেছি—কখনও আপন ক্ষমতায়, আবার কখনও বা বিশেষজ্ঞদের সহায়তায়। কী জানলাম, কী বুঝলাম তার হিসেব মেলাতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অস্তিবাদ নিয়ে লেখালেখি করেছি, নানা আলোচনাচক্রে প্রবন্ধ পাঠও করেছি। ইতোমধ্যে 'জাঁ-পল সার্ত্র্‌ঃ জীবন ও দর্শন', 'অস্তিবাদ ঃ দর্শনে ও সাহিত্যে,' এবং 'আদিউ, বিদায় সার্ত্র্‌', নামে অস্তিবাদ সম্পর্কিত তিনটির বই বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে পেরেছি। বইগুলির উৎকর্ষ বিচারের ভার পাঠকদের ওপর।

'এক্‌জিস্টেন্‌সিয়েলিজম্‌' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ 'অস্তিত্ববাদ' না করে 'অস্তিবাদ' করলাম কেন, এ প্রশ্ন অনেকের মনেই জেগেছে। নানা পত্র-পত্রিকায় 'পুস্তক পর্যালোচনা' বিভাগে আমার ইতোমধ্যে প্রকাশিত বইগুলি পর্যালোচনা করতে গিয়েও কেউ কেউ এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সবিনয়ে জানাই এ বিষয়ে আমি বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য এবং প্রখ্যাত দার্শনিক প্রয়াত ড. কালিদাস ভট্টাচার্যের সংগে আলাপ-আলোচনা করেছিলাম বই লেখার আগেই। তাঁর অভিমত হলো, "অস্তিত্ববাদ না লিখে অস্তিবাদ লেখাটাই বাঞ্ছনীয়। কারণ অস্তিত্ববাদের এই 'ত্ব' প্রত্যয় 'অস্তি' সম্বন্ধেই অপ্রত্যয় প্রবর্তিত করে, অর্থাৎ এই 'ত্ব'-এর সংযোগে 'অস্তি'-র ঘটে প্রাণবিয়োগ এবং প্রসঙ্গত কঙ্কালাবশেষ 'সারধর্ম' (essence) 'অস্তি'-মাত্রিক সত্তার (existence) জীবলীলা সাঙ্গ করে প্রেতলীলার অবতারণা করে।" বস্তুত এই কারণেই আমি 'অস্তিত্ববাদ' শব্দটি ব্যবহার না করে 'অস্তিবাদ' শব্দটি ব্যবহার করেছি।

এই বইটি লেখার মূল উদ্দেশ্য ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত জাঁ-পল সার্ত্র্‌-এর বহু-বিতর্কিত বই 'দ্য ক্রিটিক অব্‌ ডায়েলেকটিক্যাল রীজন' (ক্রিতিক দ্য লা রেঁজ দিয়ালেকতিক্‌)-এর উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু বাংলা ভাষায় পাঠকদের সামনে উপস্থিত করা। এই বইটির উদ্দেশ্য হলো সমসাময়িক দুই দর্শন অস্তিবাদ ও মার্কস্‌বাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায় কিনা তা বিচার করে দেখা। এ ব্যাপারে সার্ত্র্‌-এর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলা ভাষায় সার্ত্র্‌-এর বক্তব্যকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপিত করা নিতান্তই শক্ত কাজ। এর জন্য যে পরিভাষার প্রয়োজন তা এখনও তৈরি হয় নি। অস্তিবাদের চর্চা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রায় হয়ই না। ফলে অ্যাকাডেমিক জগতেও অনেকেই এ বিষয়ে অবগত নন। সার্ত্র্‌-এর 'ক্রিটিক'-এরও মাত্র

একটি অংশ প্রকাশিত হয়েছে ; অন্য অংশ প্রকাশিত হবার আগেই সার্ত্র্ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। যে অংশটি প্রকাশিত হয়েছে তাও আমাদের দেশে সহজলভ্য নয়। তাছাড়া, অস্তিবাদ ও মার্কস্‌বাদের গূঢ়তত্ত্বকে বাংলা-ভাষায় সহজবোধ্য করে প্রকাশ করাও সহজসাধ্য নয়। এ ধরনের আরো অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এ কাজে ব্রতী হয়েছি বাংলাভাষায় দর্শন চর্চার প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশে। অন্য একটি তাগিদও ছিল। বিশ্ব রাজনীতির আঙ্গিনায় পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে, চলছে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দাবীতে জনগণ সোচ্চার। সার্ত্র্-এর 'ক্রিটিক'-এর বক্তব্যের সঙ্গে এর আশ্চর্য এক সাদৃশ্য রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। বস্তুত সার্ত্র্-এর সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার বিকাশ এবং তাঁর রাজনৈতিক জীবনের কর্মকান্ড ও নানা ঘাত-প্রতিঘাত সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার প্রেক্ষাপটে গভীর অনুসন্ধানের বিষয়। ইতিহাসে সার্ত্র্ নন্দিত এবং নিন্দিত দুই-ই। কিন্তু তাঁর বক্তব্য কোন ভাবেই উপেক্ষার বিষয় নয়। রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্ ও কর্মী হিসাবে সার্ত্র-এর ভূমিকাটিও স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি।

বইটি লেখার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে আমাকে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ড. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ড. দেবীপ্রসাদ চট্টো-পাধ্যায়, অধ্যাপক আর্থার দান্তো, এবং ড. মৃণালকান্তি ভদ্র। দর্শন, সমাজ-নীতি ও রাজনীতি নিয়ে নানা সময়ে আলোচনা করে এঁরা আমার কাজে সহায়তা করেছেন। এঁদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। বন্ধুবর অধ্যাপক পার্থ সেন নিজ তাগিদে আমার মনে উৎসাহের সঞ্চার করে এবং সমসাময়িক রাজনীতির কিছু জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করে সেগুলির উত্তরের সন্ধানে আমাকে ব্যাপৃত রেখে বন্ধুকৃত্য সুসম্পন্ন করেছেন। শুরুতেই বইটির প্রকাশকাল দ্রুততর করার কৃতিত্ব শ্রী অরিজিৎ সান্যালের। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই দুজনকেই।

বইটি লিখতে গিয়ে ফরাসী শব্দগুলির বাংলা উচ্চারণ ও বানান বিষয়ক কাজে সারাক্ষণ অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন আমার অগ্রজপ্রতিম সহকর্মী শ্রীপ্রভাতকুমার ভক্ত। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। রত্নাবলীর শ্রীসুনীল ভট্টাচার্য ও প্রেসের অন্যান্য কর্মীদেরও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

সজীব ঘোষ

ভূমিকা

বিশ শতকী বিশ্বের বৌদ্ধিক জীবনধারার দিকে তাকালে একথা বলা বোধহয় অসংগত হবে না যে, জীবন্ত মানুষের বাস্তব সমস্যাবলী নিয়ে সক্রিয়ভাবে উৎসাহী মাত্র দুটি দর্শনের, বা বলা যায় দু ধরনের দার্শনিকীকরণের, সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এর একটি হলো মার্ক্স্বাদ, আর অন্যটি অস্তিবাদ। আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে মার্ক্স্বাদ ও অস্তিবাদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আপাতদৃষ্টিতে অনেকের কাছে মার্ক্স্বাদ ও অস্তিবাদ পরস্পর বিরোধী মনে হলেও সার্ত্র্-এর চিন্তা-ভাবনায় এ দুয়ের মিলন ঘটেছিল, যার ফলে এক নতুন বামপন্থী চিন্তার সামাজিক মতবাদের সূত্রপাত ঘটে। প্রশ্ন উঠতে পারে, সার্ত্র্ যেভাবে মার্ক্স্বাদ ও অস্তি-বাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করেছেন তা কি আদৌ সম্ভব? অথবা, অন্যভাবে বলা যায়, মার্ক্স্বাদী ও অস্তিবাদীর মধ্যে আলাপ-আলোচনা কি সম্ভব? এমন কি, 'অস্তিবাদী মার্ক্স্বাদ' কথাটি নিয়েও কেউ আপত্তি করতে পারেন। সত্যি কথা বলতে কি, মার্ক্স্বাদী ও আস্তিক অস্তিবাদীর (যেমন, কিয়েকের্গার্দ, য়্যাস্পার্স মার্সেল প্রমুখ) মধ্যে কোন রকম আলাপ-আলোচনা চলতেই পারে না। এ রকম কোন প্রয়াস য় নিরর্থক হতে বাধ্য তা বলা বাহুল্য। তবে, সার্ত্র্ যে কার্যকরভাবে মার্ক্স্বাদ ও অস্তিবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছেন, নিষ্ঠা সহকারেই তিনি যে মার্ক্স্বাদীদের সংগে অস্তিবাদের পক্ষ অবলম্বন করে আলাপ-আলোচনা

চালিয়েছেন, এটা ইতিহাসসিদ্ধ। এ কৃতিত্ব তাঁর একার। অবশ্য খানিকটা কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন আর এক ফরাসী দার্শনিক এবং সার্ত্‌র্‌-এর এক সময়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মরিস মার্লো পঁতি। মার্ক্‌স্‌বাদ ও অস্তিবাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা যেহেতু সার্তর-এর, সেহেতু বর্তমান আলোচনা মূলত সার্ত্‌র্‌-কে কেন্দ্র করেই। ফরাসী রাজনীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকেই ফরাসী কম্যুনিস্টরা সাত্‌র্‌-এর অস্তিবাদের তীব্র সমালোচনা করতে শুরু করেন। কম্যুনিস্টদের বক্তব্য হলো, 'সার্ত্‌র্‌-এর অস্তিবাদ প্রতিক্রিয়াশীলদের সেবা করে, এটা ভাববাদেরই একটা রূপ, যা সাম্রাজ্যবাদের চরম অবস্থায় বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সংকটকে প্রতিফলিত করে। অবশ্য ফরাসী প্রতিরোধ অন্দোলনে সার্ত্‌র্‌-এর যোগদানের সময় থেকেই মার্ক্‌স্‌বাদ ও অস্তিবাদের মধ্যে যোগাযোগের সূত্রপাত ঘটেছিল।

ফ্রান্স জার্মান-অধিকৃত থাকাকালীন জাতীয় লেখক সংঘের[১] সদস্য হিসেবে সার্ত্‌র্‌-এর মার্ক্‌স্‌বাদীদের সংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগে থাকার সুবাদে বিভিন্ন সময়ে তিনি তাঁদের সংগে অস্তিবাদী দর্শন নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছেন। ফ্রান্সের মুক্তির পর কম্যুনিস্ট পত্রিকা 'আক্‌সিয়ঁ' (action)-এর কর্তৃপক্ষ সার্ত্‌র্‌-কে তাঁর অস্তিবাদের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে যে-সব অভিযোগ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির জবাব দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। সার্ত্‌র্‌ প্রথমেই তার জবাবে বলেছেন যে, মার্ক্‌স্‌বাদের সংগে তাঁর চিন্তাভাবনার সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে তিনি মার্ক্‌স্‌বাদ ও অস্তিবাদের মধ্যে সহযোগিতার পক্ষপাতী। তিনি দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন ঃ (১) দুটি দর্শনই 'স্বাধীনতা'-র প্রবক্তা; উভয়ের দাবি মানুষ-ই তার ভাগ্যনিয়ন্তা এবং (২) উভয় দর্শনই কর্ম ও সংহতির দর্শন। সার্ত্‌র্‌ জানিয়েছেন যে তাঁর অস্তিবাদের ভিত্তি জার্মান-অধিকৃত ফ্রান্সের বৈপ্লবিক পরিবেশ; পাতি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের বিভ্রান্তি ও সংকট থেকে তাঁর অস্তিবাদের উৎস নয়।

১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে ফরাসী কম্যুনিস্টরা হঠাৎ প্রতিরোধ আন্দোলনের 'একতা ও সংঘবদ্ধতা'-র মানসিকতাকে বর্জন করে সার্ত্‌র্‌-এর চিন্তাভাবনাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করতে লাগলেন। তাঁদের কাছে তখন সার্ত্‌র্‌ এবং সার্ত্‌র্‌-এর সংগে জড়িত সবই, যেমন, অস্তিবাদ, লে তঁ মদার্ন, সিমোন দ্য বোভয়র, আলবের ক্যামু, মার্লো পঁতি, নিন্দনীয় ও বর্জনীয়।

১. Comite National des Ecrivains.

আঁরি ল্যফ্যবর্ মনে করতেন, "সার্ত্র্-এর অস্তিবাদের সংগে মার্ক্স্বাদের কোন সম্পর্কই নেই ; সার্ত্র্-এর অস্তিবাদ হলো কম্যুনিজম-বিরোধী একটি প্রচারযন্ত্র, ফ্রান্সের যুবশক্তিকে মোহমুগ্ধ করে রাখার এক সুচতুর কৌশল।"[২]

কিছু সময়ের জন্য অবশ্য ফ্রান্সের কম্যুনিস্ট পার্টি সার্ত্র্ সম্পর্কে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত করা থেকে বিরত ছিল। পার্টির কর্মকর্তারা তখন দোটানার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। কয়েক বছর পর সার্ত্র্ কম্যুনিস্ট পার্টির সংগে তাঁর সম্পর্ক (চাল্লশের দশকের) তিক্ততার সংগে স্মরণ করেন।[৩] ল্যফ্যবর্ এবং অন্যান্য কম্যুনিস্টরা সার্ত্র্-কে সমালোচনা করার পর কম্যুনিস্ট বুদ্ধিজীবী জাঁ কানাপা সার্ত্র্-কে জানান যে, তাঁর 'বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস্' গ্রন্থটির বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে মার্ক্স্বাদের সংগে সংগতিপূর্ণ। সার্ত্র্ ভাবলেন, কম্যুনিস্টরা আর তাঁর বিরোধী নয়। কিন্তু কম্যুনিস্টদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে কোথাও উপস্থিত থাকলে সেখানে তাঁকে সমালোচনা করা হচ্ছিল। অন্যদিকে আবার কম্যুনিস্ট পত্রিকাগুলিতে লেখার জন্য তাঁর কাছে অনুরোধও আসছিল। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে সার্ত্র্ কিছুটা হতবাক হয়ে পড়েন। এমন সময় ফ্রান্সের এক কম্যুনিস্ট নেতা সার্ত্র্-কে 'বামপন্থী ঐক্যের'[৪] জন্য সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হতে অনুরোধ জানান। এই অনুরোধ আসার অল্প কয়েকদিন পরই 'আক্সিয়ঁ' পত্রিকাটি সার্ত্র্-এর সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। এদিকে আবার ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টি চাইছিল সার্ত্র্ পার্টির সদস্য হোন ; কিন্ত সার্ত্র্ রাজী হন নি।

বিশ্ব-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বিচার করলে বলা যায় যে, তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ফরাসী মার্ক্স্বাদীদের ওপর স্তালিনের ছিল প্রচণ্ড প্রভাব। ফরাসী মার্ক্স্বাদী বুদ্ধিজীবীদের প্রধান কাজই তখন ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমর্থন করা। কেউ কেউ মনে করেন যে, সোভিয়েত স্বার্থের প্রয়োজনে স্তালিন বস্তুত ইউ-রোপীয় পার্টিগুলিকে কাজে লাগিয়েছিলেন যাতে ফরাসী মার্ক্স্বাদীরা পার্টির বৈপ্লবিক ভূমিকার সপক্ষে যুক্তির অবতারণা করতে বাধ্য হন, "যদিও বাস্তবিকপক্ষে স্তালিন পার্টির রক্ষণশীল ভূমিকার জন্য নির্দেশ দিচ্ছিলেন।"[৫] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ফ্রান্সে বৈপ্লবিক আবেগীয় উদ্যমের

---

২. Action, 40 (June 8, 1945).

৩. বিশদ বিবরণের জন্য সিমোন দ্য বোভয়র-এর Force of Circumstances দ্রষ্টব্য।

৪. 'আক্সিয়ঁ' পত্রিকার সম্পাদক হার্ভের মস্তিষ্কপ্রসূত।

৫. Alfred J. Reiber, Stalin and the French Communist Party, 1941-47.

সময়, মস্কো দ্য' গলকে 'আলিঙ্গন' করল, এবং কম্যুনিস্ট পার্টি তার বিপ্লবী জঙ্গী সদস্য ও সমর্থকদের স্তালিনের 'ইউরোপীয় স্থিতিশীলতার নীতি'-র দোহাই দিয়ে সংযত করতে বাধ্য হয়। ফরাসী মার্ক্‌স্‌বাদীরা এক উভয় সংকটের মুখোমুখি হলেন—একদিকে রুশীয় সমাজতন্ত্রের পক্ষ সমর্থন এবং অন্যদিকে ফরাসী ধনতন্ত্রের বিপ্লবীকরণ। য়্যাস্পার্স ও মার্সেল-এর অস্তিবাদ ধর্মীয় বিশ্বাসের সংগে এবং হাইডেগারের অস্তিবাদ ফ্যাসীবাদের সংগে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত থাকার জন্য মার্ক্‌স্‌বাদীরা এই ধরনের প্রতিক্রিয়া-শীলদের সংগে কম্যুনিস্ট পার্টিকে জড়াতে চান নি।

অস্তিবাদী হিসেবে সার্ত্‌র্‌ ছিলেন অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তিনি ছিলেন নিরীশ্বরবাদী এবং প্রগতিশীল, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাপ্রিয় এবং মানবদরদী, যুদ্ধবিরোধী এবং শান্তিবাদী। ফরাসী যুবসমাজের এক বিরাট অংশ ছিল তাঁর সমর্থক। এই ব্যাপারটি ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে ছিল অস্বস্তিকর। পার্টির অনেক তরুণ বুদ্ধিজীবী ছিলেন সার্ত্‌র্‌-এর চিন্তাভাবনার প্রতি অনুরক্ত, বিশেষ করে সার্ত্‌র্‌-এর 'অঙ্গীকার' ও 'দায়বদ্ধতা'-র ধারণার প্রতি। হার্ভে, জাঁ-তোসাঁই দেসান্তি, কোর্তাদ, দোমিনিক্‌ দেসান্তি প্রমুখ অনেক তরুণ বুদ্ধিজীবী, যাঁরা প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন, মার্ক্‌স্‌বাদ ও অস্তিবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সার্ত্‌রীয় প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতেন। প্রতিরোধ আন্দোলন শেষ হওয়ার পর যুদ্ধকালীন যে সংঘবদ্ধতা ও মিত্রতা গড়ে উঠেছিল তাকে ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টি উপেক্ষা করে পার্টির কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা ও রীতিনীতির ওপর গুরুত্ব দিতে শুরু করে। ফলে অস্তিবাদী মার্ক্‌স্‌বাদের জন্ম গেল অনেক পিছিয়ে; "এর মূলে রয়েছে স্তালিনের রাজ-নৈতিক জরুরী প্রয়োজনীয়তা।"[৬] পার্টির স্বার্থে কম্যুনিস্টরা সার্ত্‌র্‌-এর মতবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো সত্ত্বেও সার্ত্‌র্‌ মার্কস্‌বাদের সংগে অস্তিবাদের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টায় ছিলেন উৎসাহী।

সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সংগে সংগে অবস্থা এবং পরিস্থিতির বদল ঘটতে লাগল। ইতিহাস তার সাক্ষী। ১৯৪৮-এর পর দেখা গেল যুগশ্লাভিয়ার মার্কস্‌বাদীরা সার্ত্‌র্‌-এর সংগে আলাপ-আলোচনায় উৎসাহী। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে রুশ নেতা

৬. **Mark Poster, Existential Marxism in Post-War France.**

ক্রুশ্চেভের তীব্র আক্রমণ এবং বক্তব্য কোন কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে ঝড় তুলল। পরবর্তী সময়ে তা জনসমক্ষে প্রকাশ পেল পোলিশ মার্ক্সবাদীদের বক্তব্যে। তাঁরা ক্রমশ 'দায়বদ্ধতা'-র ব্যক্তিগত সমস্যা এবং 'স্বাধীনতা'-র ওপর গুরুত্ব দিতে শুরু করলেন। পোলিশ মার্ক্সবাদী অ্যাডাম স্যাফ্-এর দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবে উৎসাহিত ও আকৃষ্ট হয়ে পোলিশ মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা তরুণ মার্কসের রচনাবলী এবং সার্ত্রীয় অস্তিবাদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেন। তাঁরা এমন একটি নৃবিজ্ঞানের সন্ধান করতে লাগলেন যা মার্কসীয় ভাবরসে পুষ্ট। সার্ত্র যে সমস্ত সমস্যার কথা বলছিলেন সেগুলি ধীরে ধীরে কোন কোন কম্যুনিস্ট মহলে গুরুত্ব পেতে লাগল। অধিকাংশ বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা উপলব্ধি করলেন যে, স্তালিনীয় আকারে মার্কসবাদ ইউরোপে কখনই বিপ্লবী তত্ত্ব হিসেবে স্বীকৃতি পাবে না।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, 'বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস্' গ্রন্থে উল্লিখিত 'স্বাধীন ব্যক্তিমানুষ' যে এই জগতে 'সামাজিক জীব' হিসেবে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে অর্থপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে পারে তা সার্ত্র তাঁর 'দ্য ক্রিটিক অব্ ডায়েলেক্টিক্যাল রীজন' গ্রন্থে দেখাতে উদ্যোগী হয়েছেন। ঐ গ্রন্থটিতে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে মার্ক্সবাদের সংগে তাঁর অস্তিবাদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন এবং আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছেন একটি সামাজিক মতবাদ তৈরি করতে। এই মতবাদই হলো 'অস্তিবাদী মার্কস্বাদ'।

সার্ত্র-এর অস্তিবাদী মার্ক্সবাদ মুখ্যত 'ব্যক্তিজগৎ' এবং 'সামাজিক জগৎ' -এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করার এক সনিষ্ঠ প্রচেষ্টা। 'সামাজিক মানুষ'-এর মার্কসীয় প্রত্যয়টির সংগে তাঁর নিজের 'স্বাধীনতা'-র প্রত্যয়টির সংশ্লেষণ ঘটাতে তিনি ছিলেন সচেষ্ট। চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের সার্ত্র-এর রচনাগুলি সযত্নে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, দর্শন এবং রাজনীতি, অস্তিবাদী স্বাধীনতা এবং মার্কসীয় গোষ্ঠীর (community) মধ্যে সমন্বয় সাধন করার ঐকান্তিক প্রয়াসই তাঁর ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। ১৯৬০-এ আমরা দেখতে পাই সার্ত্র-এর মতবাদ একটি ইতিহাসের দর্শনের রূপ লাভ করেছে। তাঁর 'ক্রিটিক' গ্রন্থটিতে তিনি নিজের প্রথম দিকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী প্রবণতাকে সমালোচনা করে সমাজতান্ত্রিক পূর্ণ মানুষের কথা বলেছেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি বারবারই নিজের অতীত সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন, নিজের বিরুদ্ধে নিজে কলম ধরেছেন এবং নাটকীয়ভাবে তাঁর বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতাকে স্বাগত জানিয়ে পঞ্চাশোর্ধ সার্ত্র রচনা করেছেন তাঁর 'ক্রিটিক' গ্রন্থটি। উইলফ্রেড দেসান যে বলেছেন 'সার্ত্র আসলে শেষ কার্তেজীয় চিন্তাবিদ,'

একথা সার্ত্র্ মানতে রাজী নন। কারণ, তাঁর অস্তিবাদী মার্ক্‌স্‌বাদ তথা 'ক্রিটিক' গ্রন্থটির বক্তব্য হলো, মানবিক উপলব্ধি নিজ আত্মাকে কেন্দ্র করে হয় না; এর জন্য প্রয়োজন হয় গণতান্ত্রিক একটি গোষ্ঠীর, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তিই স্বাধীন সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি পাবে।

সার্ত্র্ তাঁর অস্তিবাদী মার্ক্‌স্‌বাদ রচনা করতে গিয়ে দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, নৃবিজ্ঞান, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন এবং বিশ্ব-রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর অস্তিবাদী মার্ক্‌স্‌বাদের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ:

১. এটি হলো কর্ম ও সংহতির দর্শন।

২. মানুষ সামাজিক জীব—এই উক্তির স্বীকৃতি।

৩. শ্রেণী বিরোধ অপরিহার্য—এই বিবৃতিটির সত্যতায় বিশ্বাস।

৪. মার্ক্‌স্‌বাদ এ যুগের শ্রেষ্ঠ দর্শন—এই উক্তিতে অবিচল আস্থা।

৫. স্বাধীনতা, দায়িত্ববোধ, যৌথ কর্মপ্রয়াস, তত্ত্ব ও প্রয়োগের ঐক্য, অনন্বয় বা চ্যুতি (alienation), প্রাক্সিস্ বা কর্মপ্রকল্প, দ্বান্দ্বিক যুক্তি, সামাজিক পরিস্থিতি প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ।

৬. মানব জীবনের সমস্ত সম্পর্ককে শুধুমাত্র উৎপাদন-সম্পর্ক (Production-relation) হিসেবে গণ্য না করা।

৭ এই মতবাদ এমন এক ধরনের মতবাদ যা উন্নত শিল্পীয় সমাজকে এমনভাবে প্রত্যয়ীকরণ (conceptualise) করে যা এর চ্যুতিকৃত কাঠামো বা আকারের (alienating structure) সম্ভাব্য বর্জনের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে।

৮. আপন জগৎ-সৃষ্টিতে ব্যক্তির যে সৃজনকারী ভূমিকা ও উদ্যম তার ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং প্রাক্সিসের প্রাধান্যের স্বীকৃতি।

৯. সমষ্টিগত দায়িত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ।

১০. মানবিক বিষয়ীগততাকে এবং স্বাধীনতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিচার-বিবেচনা করা। এবং

১১. স্বয়ং-সম্পূর্ণ মতবাদ গঠনের প্রয়াসকে বর্জন করা।

সার্ত্র্-এর অস্তিবাদী মার্ক্‌স্‌বাদ সমালোচনার উর্ধ্বে নয় সত্য, তবে বিশ্বরাজনীতির জটিল প্রেক্ষাপটে সার্ত্র্-এর বক্তব্যের তাৎপর্য অনুধাবন করা অত্যন্তই প্রয়োজনীয়। তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার যে পরিচয় আমরা 'ক্রিটিক' গ্রন্থটিতে পাই তার সঠিক অনুধাবনেই তা সম্ভব।

একালের অন্যতম বিতর্কিত ও বিস্ময়কর প্রতিভা জাঁ-পল সার্ত্র্ ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল ৭৫ বছর বয়সে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে যে নিঃশব্দ দর্শনের জগৎ, সেই জগতের অধিবাসী হয়েও সার্ত্র্ নিঃশব্দ ছিলেন না। দার্শনিক চিন্তার মৈনাকচূড়া থেকে বারবার নেমে এসেছেন মাটির পৃথিবীতে।

বুদ্ধিজীবী হিসেবে সার্ত্র্-এর অসাধারণত্ব এবং মনীষার পরিচয় বহন করে তাঁর রচনাসম্ভার, আর বিরল প্রতিভার অধিকারী নিষ্ঠাবান কর্মী হিসেবে তাঁর পরিচয় রয়েছে তাঁর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে। তাঁর দার্শনিক চিন্তাভাবনা, তাঁর অস্তিবাদ প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে, গল্পে, নাটকে, প্রবন্ধে, আত্মচরিতে, রাজনৈতিক ভাষ্যে এবং সাক্ষাৎকারে। শুধুমাত্র দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে তাঁর চিন্তাভাবনা সীমিত না রেখে গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি অস্তিবাদের মূল বক্তব্যকে জনমানসে বিকীর্ণ করেছেন। যথার্থ অর্থেই সার্ত্র্ ছিলেন অস্তিবাদের "প্রচার সচিব"।[১]

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে জাঁ-ব্যাপ্টিস্ট্ সার্ত্র্ এবং আন্ মেরী শোয়াইৎজের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে ২১শে জুন এঁদেরই সন্তান জাঁ-পল সার্ত্র্-এর জন্ম হয়। পরের বছরই সার্ত্র্ পিতৃহারা হন। ১৯০৬ থেকে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত

জাঁ-পল সার্ত্র্-এর চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিক নিয়ে সন্তোষ ঘোষ তাঁর "জাঁ-পল সার্ত্র : জীবন ও দর্শন" বইখানিতে আলোচনা করেছেন। উৎসাহী পাঠকরা বইটি দেখতে পারেন।

সার্ত্‌র্‌ মাতামহ শার্ল শোয়াইৎজের-এর অভিভাবকত্বে, তাঁর-ই আশ্রয়ে মায়ের সংগে দিন যাপন করেন। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে আন্‌ মেরী আবার বিয়ে করেন এবং সার্ত্‌র্‌কে তাঁর কাছে নিয়ে যান। সার্ত্‌র্‌-এর আত্মচরিত থেকে জানা যায় যে, সেখানে তাঁর দিন কেটেছে দারুণ অস্বস্তি আর অশান্তিতে। ইতোমধ্যে ১৯০৮-এ সিমোন দ্য বোভয়র এবং ১৯১৩-এ আলবের্‌ ক্যামু জন্মেছেন।

সার্ত্‌র্‌-এর শিক্ষাজীবন শুরু হয় স্থানীয় রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভর্তি হন রাষ্ট্রীয় উচ্চতর নর্মাল বিদ্যালয়ে। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে সেখানে থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে সার্ত্‌র্‌ স্নাতক হন। ঐ বছরেই ঐ পরীক্ষাতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে স্নাতক হন সিমোন দ্য বোভয়র, পরে যিনি সার্ত্‌র্‌-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও জীবন-সঙ্গিনী এবং অস্তিবাদী সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। ১৯২৯ থেকে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সার্ত্‌র্‌ বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। সেনাবিভাগে শিক্ষা সমাপ্তির পর অধ্যাপক হিসেবে সার্ত্‌র্‌ কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে বার্লিনের ফরাসী ইন্‌স্টিট্যুটে (অ্যাঁস্তিত্যু ফ্রাঁসে) রেমঁ আরোঁর জায়গায় সার্ত্‌র্‌ 'ফেলো' নির্বাচিত হন এবং এডমুণ্ড হুসার্ল ও মার্টিন হাইডেগারের কাছে সমকালীন জার্মান দর্শনের পাঠ গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে তিনি কাফ্‌কা, ফক্‌নার এবং হেমিংওয়ের রচনার সংগে পরিচিত হন। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সার্ত্‌র্‌ রচনা করেন 'দ্য ট্রান্‌সেনডেন্‌স্‌ অব্‌ দ্য ইগো,' 'দ্য ইমাজিনেশন', 'নসিয়া', 'ইন্‌টিমেসি', 'দ্য ওয়াল', 'স্কেচ্‌ ফর এ থিওরী অব্‌ ইমোশন্‌স্‌' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে তিনি ফরাসী সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে বন্দী হন। বন্দীশিবিরে অত্যাচারিত অবস্থায় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছে। কিন্তু সেই অবস্থায়ও সার্ত্‌র্‌ তাঁর সহবন্দীদের মনোবল অক্ষুন্ন রাখার জন্য নাটক লেখা ও মঞ্চস্থ করার দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে মুক্তিলাভ করলে সার্ত্‌র্‌ আবার অধ্যাপনায় ফিরে আসেন। ঐ বছরই আলবের্তো জাকোমেত্তির সংগে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্‌র্‌ জাতীয় লেখক সংঘে যোগদান করেন। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে ক্যামু, সালাক্রু, ভিলার, ককতো প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের সংগে সার্ত্‌র্‌ নাটক সম্পর্কিত বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। ঐ বছরই তিনি ফরাসী জাতীয় নাট্যশালা পরিচালনকারী কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সার্ত্‌র্‌ ফরাসী প্রতিরোধ আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন

এবং লে লেতর ফ্রাঁসে, কঁবা প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার সংগে যুক্ত ছিলেন। ফ্যাসীবাদ ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐ সব পত্র-পত্রিকায় তিনি বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ঐ সময় সার্ত্র্ সমকালীন ফরাসী দর্শনের অন্যতম পুরোধা মরিস মার্লো পঁতি এবং এবং আরো কয়েকজনের সংগে বুদ্ধিজীবী-দের প্রতিরোধ সংস্থা 'সমাজবাদ এবং মুক্তি' প্রতিষ্ঠা করেন, যদিও তা খুব একটা সফল হয় নি এবং কয়েকমাস পর তা ভেঙ্গে যায়। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্ অধ্যাপক পদে ইস্তফা দেন—উদ্দেশ্য ছিল সারাক্ষণ লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করা। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি 'দ্য ফ্লাইজ', 'দ্য ইমাজিনারী', 'বিয়িং অ্যাণ্ড নাথিংনেস' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি রচনা করেন।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্ 'কঁবা' ও 'ফিগারো' পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করেন। সেখানে তিনি লেভি স্ত্রাউস, আঁদ্রে মার্সোঁ, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, ব্রতোঁ প্রমুখ চিন্তাবিদদের সংগে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি ফরাসী সরকারী খেতাব 'লেজিয়োঁ দ্য নর' প্রত্যাখান করেন এবং 'রোডস টু ফ্রিডম্' গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন। ঐ বছরেই প্যারিসে তাঁর 'এক্জিস্টেন্সিয়েলিজম্ অ্যাণ্ড হিউ-ম্যানিজম্' শীর্ষক বক্তৃতা অস্তিবাদের প্রভাব অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। ১৯৪৫-এর ১৫ই অক্টোবর সার্ত্র্ তাঁর সাধের 'লে তঁ মদার্ন', পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর 'এক্জিস্টেন্-সিয়েলিজম্ অ্যাণ্ড হিউম্যানিজম্', 'রিফ্লেকশন্ অন্ দ্য জ্যুইস্ কোশ্চেন', 'ডেথ্স্ উইদাউট সেপুলচার', 'দ্য রেসপেক্টেব্ল্ প্রস্টিট্যুট' প্রভৃতি গ্রন্থ। ঐ বছরই তিনি সংবিধান সম্পর্কিত রেফারেণ্ডাম-এ ভোটদানে বিরত থাকেন এবং য়ুনেস্কো-র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে 'লেখকের দায়িত্ব' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। ক্যামুর সংগে প্রথম বিরোধের সূত্রপাত ঐ বছরেই।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্ প্রকাশ করেন 'সিচুয়েশন-১', 'বোদলের', 'দ্য গেম্স্ আর ওভার' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং মৃত বন্ধু পল নিজঁ সম্পর্কে কম্যু-নিস্টদের অপবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। রুশ পত্রিকা 'প্রাভদা'-র আক্রমণের উত্তরও তিনি দেন ঐ বছরেই। রেমঁ আরোঁ এবং আর্থার কোয়েস্-লারের সংগে তাঁর বিচ্ছেদও ঘটে ঐ সময়ে। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্-এর যে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'ইন দ্য মেস্', 'দ্য ডার্টি হ্যাণ্ড্স্' এবং 'সিচুয়েশন-২'। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ 'দ্য ডার্টি হ্যাণ্ড্স্' নাটকটিকে সোভিয়েত বিরোধী বলে চিহ্নিত করলে সার্ত্র্ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। ভ্যাটিকান শহরের পোপের দপ্তর থেকে সার্ত্র্-এর সমস্ত রচনাকে বর্জনের

আদেশ জারি করা হয় ঐ বছরেই। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্‌র্‌ মার্লো পঁতির সংগে সোভিয়েত কন্‌সেন্‌ট্রেশন্‌ ক্যাম্পের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। ইতিমধ্যে সার্ত্‌র্‌ প্রকাশ করেন 'রোড্‌স্‌ টু ফ্রিডম' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড, 'ডেথ ইন্‌ দ্য সোল', 'সিচুয়েশন-৩', 'দ্য ডেভিল অ্যাণ্ড দ্য গুড গড' 'সেণ্ট জেনে ঃ কমেডিয়ান অ্যাণ্ড মার্‌টিয়ার' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি।

১৯৫২ খ্রীস্টাব্দ সার্ত্‌র্‌-এর জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্যামুর সংগে তাঁর ঐ বছরেই রাজনৈতিক কারণে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এর পর আর কোনদিনই দুজনের সাক্ষাৎ ঘটে নি। ঐ বছরের নভেম্বর মাসে সার্ত্‌র্‌ এক সান্ধ্য ভোজে মিলিত হন পিকাসো ও চ্যাপলিনের সংগে। ঠাণ্ডা লড়াই-এর বিরুদ্ধে ঘোষণাপত্রে তিনি স্বাক্ষর করেন ঐ বছর এবং ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে বার্লিনে বিশ্বশান্তি কমিটির অধিবেশনে এবং ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে হেল্‌সিংকির বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সম্মেলনে সার্ত্‌র্‌ যোগদান করেন। ১৯৫৪-তে তিনি ফরাসী-সোভিয়েত সংঘের সহ-সভাপতি মনোনীত হন এবং প্রথম সোভিয়েত রাশিয়া পরিভ্রমণ করেন। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে হাঙ্গেরীতে সোভিয়েতের হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করেন সার্ত্‌র্‌, ফলে কম্যুনিস্ট পার্টি ও ফরাসী-সোভিয়েত সংঘের সংগে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। ঐ বছরে প্রকাশিত হয় তাঁর 'নেক্রাসভ্‌' নাটকটি। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে আলজিরিয়ায় ফরাসী সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান সার্ত্‌র্‌। শুধু তাই নয়, আলজিরিয়ার মুক্তিসংগ্রামকে দমন করা থেকে বিরত থাকার জন্য ফরাসী সৈন্যদের কাছে আবেদন জানান। তাঁর ঐ কাজের জন্য দক্ষিণপন্থী সন্ত্রাসবাদীরা দু'দু'বার তাঁর ফ্ল্যাটে বোমা ফেলে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে। তদানীন্তন ফরাসী রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্য' গলকে তাঁর উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্যরা এবং প্রাক্তন যোদ্ধারা সার্ত্‌র্‌-এর ঐ ধরনের 'রাষ্ট্রবিরোধী' কাজের জন্য তাঁকে কারাদণ্ডে বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার দাবী জানালে রাষ্টপতি দ্য'গল ফরাসী প্রতিরোধ আন্দোলনে সার্ত্‌র্‌-এর গৌরবজনক ভূমিকার কথা স্মরণ করে বলেছিলেন—"বুদ্ধিজীবীদের কথা বাদ দাও···, ভলতেয়ারকে কখনও গ্রেপ্তার করা হয় না"।

১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় সার্ত্‌র্‌-এর 'অ্যালটোনা' এবং বহু বিতর্কিত গ্রন্থ 'দ্য ক্রিটিক অব ডায়েলেকটিক্যাল রীজন'। ঐ বছরে সার্ত্‌র্‌ তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মের জন্য লাভ করেন ওমেগা পুরস্কার (ইতালি)। তিনি ঐ বছরে কিউবা ও যুগোশ্লাভিয়া ভ্রমণ করেন এবং ফিদেল কাস্ত্রো, চে গুয়েভারা, মার্শাল টিটো প্রমুখ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌দের সংগে নানা বিষয়ে

আলাপ-আলোচনা করেন। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্ রোমে গ্রাম্চি ইনস্টিটিউটো 'রহস্যবাদ এবং মার্কস্বাদ' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন এবং গারোদির সংগে 'দ্বন্দ্ববাদ' সম্পর্কে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্ সিমোন দ্য বোভয়রের সংগে রাশিয়া ভ্রমণে গেলে ক্রুশ্চেভ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। ঐ বছরই তিনিই শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশে বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য আবার রাশিয়া যান।

১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্ প্রকাশ করেন তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'দ্য ওয়ার্ড্স্', এবং 'সিচুয়েশন-৪,৫,৬'। 'নীতি ও সমাজ' সম্পর্কে সার্ত্র্ রোমে গ্রাম্চি ইনস্টিটিউটে এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন এবং নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন ঐ বছরই। ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তার 'সিচুয়েশন-৭' গ্রন্থটি। ঐ বছর তিনি ভিয়েতনামের মানুষের ওপর মার্কিন সৈন্যদের বর্বর অত্যাচার ও আমেরিকার ভিয়েতনাম নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য পরিদর্শক-অধ্যাপক হিসেবে আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। দীর্ঘদিনের পরিচিতা ইহুদী মেয়ে আরলেত্ এল. কাইমকে দত্তক-কন্যা হিসেবে গ্রহণ করেন সার্ত্র্ ঐ সময়েই। ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে বার্ট্রাণ্ড রাসেল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্টারন্যাশনাল ওয়ার ক্রাইম্স্ ট্রাইব্যুনাল'-এর সভাপতি হিসেবে সার্ত্র্ প্রকাশ করেন 'ভিয়েতনাম ঃ ইম্পিরিয়্যালিজম্ অ্যাণ্ড জেনোসাইড' নামক চাঞ্চল্যকর তথ্যপুস্তিকাটি। ঐ পুস্তিকায় তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভিয়েতনামের গণহত্যার জন্য আমেরিকাকেই দায়ী করেছেন।*

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্ মে মাসের ছাত্র-বিদ্রোহকে সমর্থন করেন এবং পুলিশের দমননীতির নিন্দা করেন। চরমপন্থী এবং মাওবাদী ছাত্রসংস্থা কর্তৃক প্রচারিত প্রচারপত্রে তাঁর নাম ব্যবহার হতে দেখেও তিনি কোন আপত্তি জানান নি। এমন কি, সরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্রোহী চরমপন্থী ছাত্রদের সংগে তিনি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এক বেতার ভাষণে সার্ত্র্ ঐ সময় বলেন, "এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে ছাত্রদের একমাত্র যে সম্পর্ক হতে পারে তা হলো এটাকে ভাঙ্গার, আর তা করতে হলে একমাত্র উপায় হলো তাদের রাস্তায় নেমে পড়া।"

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্ হারিয়েছিলেন তার বি-পিতা জোসেফ নাঁসি-কে এবং ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী হারালেন তাঁর মাকে। ঐ বছর

* ঐ ট্রাইবুনালে সার্ত্র্ ছাড়াও ছিলেন স্টোক্লি কারমাইকেল, ডেভিড ডেলিংগার লরেন্স শোয়ার্টজ্, আইজাক্ ডয়েট্শার, এবং রাসেল স্বয়ং।

তিনি চেকোশ্লোভিয়ায় সোভিয়েত দমননীতি ও সলজেনিৎসিনকে সোভিয়েত লেখক সংঘ থেকে বহিষ্কারের তীব্র প্রতিবাদ জানান।

১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্ প্রকাশ করেন "ফ্লোবের্ঃ দ্য ইডিয়ট অব্ দ্য ফ্যামিলি'-র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। ঐ বছরেই তিনি যে তিনটি পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সেগুলি হলো 'লা কোজ দ্য প্যপ্ল্', 'তু' এবং 'রেভল্যুসিয়োঁ'। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর 'সিচুয়েশন-৮ ও ৯' এবং 'দ্য ইডিয়ট অব্ দ্য ফ্যামিলি'-র তৃতীয় খণ্ড। পরের বছর এক প্রবন্ধের মাধ্যমে সার্ত্র্ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করে মার্চ মাসের নির্বাচন থেকে দূরে থাকার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্ প্রকাশ করেন 'ওয়ান ইজ রাইট ইন্ রিভল্টিং' নামক একটি বিতর্কমূলক রাজনৈতিক রচনা। ১৯৭৬-এ প্রকাশিত হয় তাঁর 'সিচুয়েশন-১০'। ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে দত্তক-কন্যা আরলেৎ-কে নিয়ে সার্ত্র্ জেরুজালেম ভ্রমণে যান। এর আগের বছরেই তিনি 'আমার ইজরায়েলীয় বন্ধুদের প্রতি' শীর্ষক আবেদনপত্রে ইজরায়েলীয়দের প্যালেস্টানীয়দের সংগে আলোচনায় বসতে আহ্বান জানান।

বয়স বাড়ার সংগে সংগে সার্ত্র্-এর শরীরও খারাপ হতে থাকে। ১৯৭৪-এর আগেই দু'বার হার্ট স্ট্রোক্ হয়ে গিয়েছিলো। ১৯৭৫-তে হয়েছিল আর্থারাইটিস্-এর আক্রমণ। দৃষ্টিশক্তিও প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলেন। অবসাদ আর বিষণ্নতা প্রায়ই সার্ত্র্-কে আচ্ছন্ন করে রাখত। কিন্তু বিশ্রাম নিতে তিনি জানতেন না। সারাক্ষণ কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন। যখন বুঝতে পারতেন শরীরে কুলোচ্ছে না তখনই নানা উত্তেজকের সাহায্যে শরীরটাকে চাঙা রাখার চেষ্টা করতেন। ফলে বাতি নেবার দিন এগিয়ে এলো। অসুস্থ সার্ত্র্-কে ১৯৮০-র ২০শে মার্চ ব্রুসেই হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ১৬ই এপ্রিল ঐ হাসপাতালেই সার্ত্র্ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

সার্ত্র্ যখন মারা গেলেন তখন তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শোক প্রকাশ করতে এসেছিলেন হাজার হাজার লোক। বিরাট এক শোকমিছিল শবযানকে অনুসরণ করে উপস্থিত হয়েছিল মোঁপারনস সেমিট্রি-তে। সার্ত্র্-এর দেহ ঐ সেমিট্রি-তে সমাধিস্থ করা হয়। মানবদরদী ঐ মানুষটির জন্য প্রতিদিন ঐ সমাধিতে অসংখ্য তাজা ফুলের স্তবক আজও পড়ে।

অস্তিবাদের স্বরূপ

সমকালীন সাহিত্য ও দর্শনের 'অন্যতম আন্দোলন হিসেবে অস্তিবাদ নতুন হলেও এর শেকড় রয়েছে হিব্রু সাহিত্যে এবং জার্মান কল্পরম্যবাদ বা রোমান্টিসিজমের মধ্যে। আধুনিক কালে অস্তিবাদের উদ্ভব হয়েছে জার্মান দার্শনিক এডমুণ্ড হুসার্লের মানস-ঘটনাবাদ বা ফেনোমেনোলজি থেকে, যদিও কোপেনহেগেনের দার্শনিক সোরেন কিয়ের্কেগার্দের চিন্তায় অস্তিবাদী দর্শনের মৌল বৈশিষ্ট্য প্রথম পরিলক্ষিত হয়। কিয়েরকেগার্দই অস্তিবাদের আদিগুরু।

অস্তিবাদ বিশ শতকের বহু শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকার, কবি ও দার্শনিকের ভাব-ভাবনার দর্পণে এবং জীবনচর্যা ও জীবনচর্চায় প্রতিফলিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই পশ্চিমী দুনিয়ায় অস্তিবাদ নিয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন চলেছে। আমাদের দেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি; তবে অস্তিবাদ নিয়ে হৈচৈ-এর মাত্রার তীব্রতা ও ব্যাপকতা এখানে অপেক্ষাকৃত কম।

দর্শনের ইতিহাসে অস্তিবাদের দুটি রূপ দেখতে পাওয়া যায় —আস্তিক ও নাস্তিক। সোরেন কিয়েরকেগার্দ, কার্ল য়্যাস্পার্স ও গেব্রিয়েল মার্সেলের চিন্তাধারা আস্তিক-অস্তিবাদ হিসেবেই চিহ্নিত। মানুষকে বড়ো করে তুলে ধরলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা ঈশ্বর বা পরমসত্তা জাতীয় কোন তত্ত্বে বিশ্বাসী। পক্ষান্তরে ফ্রীদ্রিষ্ নীৎসে, জাঁ-পল সার্ত্র্ ও আলবের ক্যামুর দর্শন

নাস্তিক-অস্তিবাদ নামে অভিহিত। ঈশ্বর তাঁদের কাছে মৃত : মানুষই সব। মার্টিন হাইডেগারের দর্শনকে আস্তিক বা নাস্তিক কোন আখ্যায়-ই আখ্যায়িত করা সংগত নয় বলে মনে হয়, কেননা, ঈশ্বর সংক্রান্ত সরাসরি প্রশ্নে তিনি ছিলেন উদাসীন। ফরাসী দার্শনিক মরিস মার্লো পঁতিকে অন্যান্য অস্তিবাদীদের মতো 'অস্তিবাদী' লেবেল হয়তো মারা যাবে না, কেননা, দর্শনের ইতিহাসে তিনি মানসঘটনাবাদী হিসেবেই চিহ্নিত। তবে, মানসঘটনাবাদের জনক হুসার্ল এবং অস্তিবাদের প্রচার সচিব সার্ত্র্-এর দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছেন গভীরভাবে। দর্শনের ইতিহাসে মার্লো পঁতিকে তাই অনেকে 'অস্তিবাদমূলক মানসঘটনাবাদী' হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন।

অস্তিবাদীরা কোন দার্শনিক 'সম্প্রদায়' বা 'গোষ্ঠী'-র অন্তর্ভুক্ত নন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাদাভাবে তাঁরা নিজ নিজ বক্তব্য রেখেছেন। ফলে, সাধারণভাবে সর্ববাদীসম্মত কোন মতবাদ অস্তিবাদ থেকে পাওয়া যায় না। তবে, মোটামুটিভাবে বিভিন্ন অস্তিবাদীদের বক্তব্য জানার পর অস্তিবাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের একটা পরিচয় পাওয়া যায়, আর তা থেকেই আমরা অস্তিবাদ সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারি।

অস্তিবাদ দার্শনিকীকরণের অন্যতম পন্থা, দার্শনিক মতবাদের সমষ্টি নয়। এই দার্শনিকীকরণের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। অস্তিবাদ কোন বস্তু বা বস্তুসামগ্রীর দর্শন নয়, এ হলো মনুষ্য-পরিস্থিতির দর্শন। এ দর্শন বিষয়ীর দর্শন, বিষয়ের দর্শন নয়। এ দর্শনে যুক্তির বদলে অনুভূতি ও কর্মই প্রাধান্য পেয়েছে। দর্শকের নয়, অভিনেতার দৃষ্টিকোণ থেকে অস্তিবাদীরা জীবন ও জগৎকে দেখেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন, মূল্যায়ন করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিভংগী তাই বিষয়ীগত। তাঁদের কাছে সত্য কদাপি ব্যক্তিমন যোগচ্ছিন্ন হতে পারে না। অস্তিবাদ অনুসারে, এই বিরাট পৃথিবীর মূল্য আমার কাছে ততোটুকুই যতোটুকুতে আমি 'জড়িয়ে' আছি। সত্যের মূল্য তখনই যখন আমার অন্তরের গভীরে তার উপলব্ধি ঘটছে, যখন তার সংগে আমার আমিত্বের যোগাযোগ হচ্ছে।

অস্তিবাদ ভাববাদ ও প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া। ভাববাদ ব্যক্তি-মানুষকে পরমসত্তার বা নৈর্ব্যক্তিক সার্বিক বুদ্ধির অংশ হিসেবে রূপায়িত করেছে। অন্যদিকে, প্রকৃতিবাদ মানুষকে জড় জগতের অংশে পরিণত করেছে, মানুষকে করে তুলেছে যান্ত্রিক নিয়মের অধীন। ভাববাদ ও প্রকৃতিবাদ উভয়েই মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিককে, অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাধীনতাকে উপেক্ষা করেছে। মূর্ত মানুষের বাস্তবতা, স্বাধীনতা, এবং দায়বদ্ধতা

ভাববাদ ও প্রকৃতিবাদে নিশ্চিহ্ন। পক্ষান্তরে অস্তিবাদ মূর্ত মানুষের দায়িত্ব ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য যে কোন মূল্য দিতে বদ্ধপরিকর। হেগেলের সর্বব্যাপী জ্ঞানবাদ ও বিশ্বগ্রাসী পরমাত্মাবাদের হাত থেকে দর্শনকে মুক্ত করার মহান দায়িত্ব তাই অস্তিবাদীরা নিয়েছেন।

অস্তিবাদ অনুসারে, মানব-অস্তিত্বের আসল রহস্য বুদ্ধি বা চিন্তার মাধ্যমে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় বেঁচে থাকার বাস্তবতার মধ্যে। মনের স্বমুখিনতায় নিহিত আছে অস্তিত্বের আসল রহস্য। আস্তিক বা নাস্তিক, মার্ক্সীয় বা অমার্ক্সীয়, ক্যাথলিক বা প্রটেস্টাণ্ট সব অস্তিবাদীরাই এ ব্যাপারে একমত যে, কোন ফরমুলায় বা সূত্রাকারে মানবজীবনের ও মূর্ত অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। বুদ্ধি অস্তিত্বের রহস্য উন্মোচনে অক্ষম। অস্তিবাদ অনুসারে, 'বেঁচে থাকা' (to live) আর 'অস্তিত্বশীল হওয়া' (to exist) এক নয়। অর্থহীন জীবনযাপন করাকে 'বেঁচে থাকা' বলা যায়, কিন্তু 'অস্তিত্বশীল হওয়া' বলা যায় না কিছুতেই।

সকল অস্তিবাদীরাই এ বিষয়ে একমত যে, "অস্তিত্ব সারধর্মের পূর্ববর্তী"। এটাই অস্তিবাদী দর্শন ও সাহিত্যের মূল তত্ত্ব। অস্তিবাদকে বুঝতে হলে এই মূল তত্ত্বটিকে ভাল ভাবে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। দর্শনের ইতিহাসের আদিযুগ থেকেই 'অস্তিত্ব' (existence) ও 'সারধর্ম' (essence) এই দুটি শব্দ নিয়ে দার্শনিকেরা অনেক আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করে আসছেন। দর্শনের ইতিহাসে তাই দেখা যায় চিন্তারাজ্যে কখনও অস্তিত্বের প্রাধান্য, কখনও বা সারধর্মের প্রাধান্য। যে বৈশিষ্ট্যের জন্য কোন বস্তু যা তাই হয়েছে, তাকেই সেই বস্তুর সারধর্ম বলা হয়। এই সারধর্ম ঐ জাতীয় বস্তুর শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য রূপে আমাদের বুদ্ধি বা চিন্তার কাছে ধরা দেয়। এই অর্থে সারধর্ম সব সময়ই বুদ্ধিগ্রাহ্য সামান্য ধারণা হিসেবে স্বীকৃত। প্লেটো থেকে শুরু করে সকল ভাববাদী দার্শনিকরা সারধর্মকেই দর্শনে প্রাধান্য দিয়েছেন, মুখ্য বলে গণ্য করেছেন, অস্তিত্বকে বরাবরই করেছেন অবজ্ঞা বা অবহেলা। ভাববাদী চিন্তায় তাই 'অস্তিত্ব' শব্দটি ক্ষয়িষ্ণুতা ও পরিবর্তনশীলতাকে সূচিত করে। তাই আমাদের বুদ্ধি ঐ জগৎ থেকে সরে এসে অপরিবর্তনশীল, শাশ্বত ও সার্বিক সারধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এ জগৎ 'ধারণা' ও 'আকার'-এর জগৎ। সারধর্ম সর্বদাই বিমূর্ততা ও সার্বিকতা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। কিন্তু দর্শনের ইতিহাস সযত্নে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, চিন্তা-জগতে সারধর্মের একচ্ছত্র আধিপত্য চিরকাল বজায়

থাকে নি ; এর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। আর এ বিদ্রোহ অস্তিত্বের বিদ্রোহ ; সার্বিকতা, বিমূর্ততা ও সারধর্মের বিরুদ্ধে বিশেষ এবং মূর্ততার বিদ্রোহ। আধুনিক অস্তিবাদ বলতে হেগেলের সারধর্মবাদের বিরুদ্ধে অস্তিত্বের মূর্ততার বিদ্রোহকেই বোঝায়, আর এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছেন অস্তিবাদের আদিগুরু কিয়েকের্গার্দ এবং তা বিশ্বদরবারে পৌঁছে দিয়েছেন সার্ত্র্‌।

'অস্তিত্ব' শব্দটি নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণভাবে, কোন বস্তুর অস্তিত্বশীলতা জগতে সেই বস্তুর বাস্তব অবস্থিতিকে নির্দেশ করে। অস্তিত্বশীল হওয়ার অর্থই হলো বস্তুজগতে দৈশিক ও কালিক সম্পর্কযুক্ত হওয়া। কিন্তু 'ঈশ্বর অস্তিত্বশীল'—এ জাতীয় বচনে যখন 'অস্তিত্ব' শব্দটির প্রয়োগ হয়, তখন তা কোন প্রকারেই ঈশ্বরের এই জগতে বাস্তব অবস্থিতিকে নির্দেশ করে না। 'সংখ্যার কি অস্তিত্ব আছে ?'—এ জাতীয় বচনে 'অস্তিত্ব' শব্দটির ব্যবহারও অন্য অর্থে হয়েছে। 'অস্তিত্ব' শব্দটির বিভিন্ন অর্থের পিছনে না ছুটে এবার দেখা যাক্‌ 'অস্তিত্ব' শব্দটিকে অস্তিবাদীরা কী অর্থে গ্রহণ করেছেন। অস্তিবাদীদের কাছে 'অস্তিত্ব' শব্দটি একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একমাত্র মানুষ-ই অস্তিত্বশীল—এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, গাছপালা, টেবিল চেয়ার, ঘর-বাড়ি মনুষ্যেতর জীব, ইত্যাদির কোন অস্তিত্ব নেই। অস্তিবাদ অনুসারে, এ সব কিছুরই 'বাস্তব সত্তা' আছে, জগতে এগুলি 'বর্তমান', কিন্তু 'অস্তিত্বশীল' নয়। অস্তিবাদীদের কাছে 'অস্তিত্ব' শব্দটি সক্রিয়ভাবে ও স্বাধীনভাবে সংকল্প, নির্বাচন (বা মনোনয়ন)ও কর্ম করে দায়িত্বশীল ব্যক্তি হয়ে অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করাকেই নির্দেশ করে। অস্তিবাদ নিঃসন্দেহে তাই একটি ব্যবহারিক দর্শন। অস্তিবাদ অনুসারে, অস্তিত্বশীলতার অর্থই হলো স্বাধীনভাবে ও সক্রিয়ভাবে 'আমি কী হবো' তা নির্বাচন করা। মানুষ প্রতি মুহূর্তে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয় এবং নতুন করে নিজেকে তৈরি করে। ব্যক্তি প্রথমে অস্তিত্বশীল এবং পরে তার সারধর্ম বা প্রকৃতি সে তার অস্তিত্বের মাধ্যমেই অর্জন করে। মানুষের কোন স্থিরীকৃত বা নির্দিষ্ট সারধর্ম নেই। অস্তিত্ব তাই সারধর্মের পূর্ববর্তী।

শিল্প-সভ্যতা, যান্ত্রিক কলাকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিক প্রবণতার বিরুদ্ধেও অস্তিবাদ প্রতিবাদমুখর। যুদ্ধোত্তর সমাজে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ পলে পলে যারা দেহ-প্রাণ-মন বিনিময়ে এ সভ্যতার মূল্যের কড়ি গুণছে, তাদের কাছে এ সভ্যতা মেকী মনে হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। আজকের

সভ্যতায় মানুষের সমস্যা প্রতিনিয়ত তাকে আশংকা ও উদ্বেগের চাপের টানা-পোড়েনে অস্থির করে দিচ্ছে। এই যান্ত্রিক শিল্প সভ্যতার ফল হৃদরোগ, রক্তচাপ, নিঃসংগতা, বিচ্ছিন্নতা, মানসিক বিকার ও বিকৃত রুচি। মরণের নতুন নতুন পথ আবিষ্কৃত হচ্ছে, স্নায়ুচাপ বাড়ছে, ব্যক্তিকে তার স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে গোষ্ঠীর আনুগত্য স্বীকার করতে পড়েছে। ক্লান্ত অবসন্ন মানুষ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যুদ্ধে হার মেনে হতাশ হয়ে যাচ্ছে। গণসমাজের চাপে সে পিষ্ট। মানুষের এই ছবি অস্তিবাদীদের কাছে অসহ্য। অস্তিবাদ অনুসারে, মানুষ আজ যন্ত্রের দাস। যান্ত্রিক শিল্পসভ্যতার বিরুদ্ধে অস্তিবাদ তাই প্রতিবাদমুখর। অস্তিবাদীরা মনে করেন, এ সভ্যতার কাছ থেকে আমরা যা পাচ্ছি তা আলো নয়, আলেয়া। বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করতে না পারলে মানুষ অচিরেই হারাবে তার একান্ত সম্পদ—তার অন্তরাত্মা।

অস্তিবাদকে মুখ্যত মনুষ্যজীবন ও বিশ্বে মননেতর বস্তুনিচয়কে বুদ্ধির প্রকারে (Categories) রূপান্তরিত করার বিরুদ্ধে এক জেহাদ বলা যায়। সাধারণভাবে অস্তিবাদকে অধিবিদ্যা হিসেবে চিহ্নিত করা সমীচীন নয়, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক-ধর্মীয় চিন্তাধারার উদ্দীপক হিসেবেই এর গুরুত্ব বেশী। অস্তিবাদীরা মনে করেন যে, দর্শনের একটি ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে, যা নির্দিষ্টরূপে বর্ণিত হওয়া উচিত। এদিক থেকে বিচার করলে অস্তিবাদীদের বক্তব্য ও অবদান আধুনিক বিশ্লেষণী দর্শনের বক্তব্য ও অবদানের চেয়ে অধিকতর স্পষ্ট, জোরালো ও সমর্থনযোগ্য।

অস্তিবাদ অনুসারে, আজকের দিনে আরাম-কেদারায় শুয়ে কোন দর্শন রচিত হতে পারে না। বিমূর্ত চিন্তায় মগ্ন থাকাকে সেজন্যই অস্তিবাদে 'অপরাধ' (নৈতিক) বলে গণ্য করা হয়। যে দর্শনের সংগে মর্ত্যজীবনের কোন সম্বন্ধই নেই, অস্তিবাদীরা তাতে আগ্রহী নন। বাস্তব মনুষ্য-পরিস্থিতির প্রতি তাঁরা গভীর আগ্রহী এবং কোন কোন অস্তিবাদী মার্কস্-বাদের প্রভাবে অসংগত ও অপ্রীতিকর মনুষ্য-পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধনেও উৎসাহী। অস্তিবাদীরা মনে করেন, আতংক, উদ্বেগ, হতাশা, অপরাধবোধ, সসীমতা, একাকিত্ব, স্বাধীনতা-পরাধীনতা, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা, লজ্জা-ঘৃণা-ভয়, হিংসা, বিচ্ছিন্নতা বা চ্যুতি, মৃত্যুবোধ ইত্যাদি মানব-অস্তিত্বের অপরিহার্য অংগ। এগুলিকে বাদ দিয়ে বা এড়িয়ে গিয়ে মানুষের যথার্থ দর্শন ও সাহিত্য রচিত হতে পারে না। অস্তিবাদ তাই যুগভাবনার হুবহু প্রতীক বলেই মনে হয়। এতদিন পর্যন্ত দার্শনিকেরা যে ধারায় চিন্তা

করেছেন অস্তিবাদী চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দর্শনে এতদিন ধরে যে ভাবে মানুষকে চিত্রায়িত করা হয়েছে, যেভাবে মানুষের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, অস্তিবাদ তার বিরুদ্ধে এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ।

মোটামুটিভাবে এই হলো অস্তিবাদ। অস্তিবাদ যেহেতু কোন প্রণালীবদ্ধ দর্শন নয়, এবং যেহেতু অস্তিবাদীরা কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নন, সেহেতু অস্তিবাদকে বুঝতে গেলে আলাদাভাবে জানতে হবে অস্তিবাদীদের। তবে, এরও আগে জানা প্রয়োজন, কেন এই অস্তিবাদ ?

'অভিজ্ঞতাবাদ', 'বুদ্ধিবাদ', 'বস্তুবাদ', 'ভাববাদ', 'দৃষ্টবাদ', 'প্রয়োগবাদ', 'বিশ্লেষণী দর্শন', প্রভৃতির মতো অস্তিবাদ দর্শনের কোন একটি বিশেষ 'লেবেল' নয। আমরা যদিও কোন কোন দার্শনিককে 'অস্তিবাদী' বলে চিহ্নিত করি, তাঁরা কিন্তু নিজেদের কোন সম্প্রদায়ভুক্ত করতে রাজী নন। এমন কি, 'অস্তিবাদ', 'অস্তিবাদী' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করতেও এখন তাঁদের আপত্তি। এই শব্দ দুটির যথেচ্ছ ব্যবহারই এর মূল কাবণ। অস্তিবাদ আসলে এক ধরনেব দার্শনিকীকরণ, বা বলা যেতে পারে, এ হলো এক ধরনের দর্শন-ক্রিয়া (Philosophical activity), —১৯৪০ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত ইউরোপে যার প্রসার ঘটেছে এবং আজ পর্যন্ত যাব প্রভাব মানব-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। অস্তিবাদী দর্শনের বৈশিষ্ট্য প্রচলিত বা গতানুগতিক পাশ্চাত্য দর্শনেব বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রশ্ন হলো, পাশ্চাত্ত্য দর্শনের-এর নানা রূপ থাকা সত্ত্বেও অস্তিবাদের জন্ম হলো কেন ? নিশ্চয় এর কোন কারণ আছে। কেন এই দর্শন-ক্রিয়া বা দর্শন-আন্দোলনের উদ্ভব হলো তা জানা না থাকলে অস্তিবাদী দার্শনিকদের চিন্তা-ভাবনা ও কর্মকাণ্ডের-আলোচনা সম্ভব নয়।

ইউবোপের মাটিতে কেন জন্ম নিল অস্তিবাদ ? কেন অস্তিবাদ ইউরোপের বিভিন্ন মনীষীদের সানুরাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করল ? কী ছিল এই দার্শনিকী-করণ ও আন্দোলনের মধ্যে যাতে আকৃষ্ট হলেন প্রখ্যাত অনেক নাট্যকার, চিত্রকর, কবি, ঔপন্যাসিক, শিল্পী, ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট যাজক, মনো-বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকরা ? ইউরোপের অনেক তরুণ বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণভাবে যুবসমাজ কেন এই আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে চাইলেন সারা বিশ্বে ? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কেন এই আন্দোলন ইউরোপের গণ্ডী পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ল নানা দিকে, জীবনের নানা ক্ষেত্রে ? এরকম আরো 'কেন'-র উত্তর আমাদের পেতে হবে যদি অস্তিবাদকে তথা অস্তিবাদীদের জানতে হয়, বুঝতে হয়।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস সযত্নে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, এতদিন ধরে অধিকাংশ পাশ্চাত্য দার্শনিকরাই অনুধ্যানমূলক (speculative) দর্শনের প্রতি ছিলেন আসক্ত এবং দর্শন-মণ্ডলী (Philosophical System) গঠনে উৎসাহী। বিমূর্ত দর্শন-চিন্তা ও নৈর্ব্যক্তিক ভাবনায় তাঁরা ছিলেন মগ্ন। মানব-অস্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি তাঁরা বিশেষ আগ্রহ দেখান নি। রক্তমাংসে-গড়া ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব ও তার সমস্যাবলী গতানুগতিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনে উপেক্ষিত হওয়ায় পাশ্চাত্ত্য দর্শন হয়ে পড়েছে বাস্তবতা-বর্জিত।

মধ্যযুগের ইউরোপের পোপ অধ্যুষিত খ্রীস্টীয় জগতে যেমন ব্যক্তি মানুষের কোন মূল্যই ছিল না, তেমনি পাশ্চাত্ত্যের ভাববাদী দর্শনেও ব্যক্তি মানুষের কোন মূল্য দেওয়া হয় নি। রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ফলে মানবতাবাদ যখন তার যথার্থ স্বীকৃতি পেল তখন খ্রীস্টীয় জগতের সর্বগ্রাসী ঈশ্বরতত্ত্বের হাত থেকে উদ্ধার পেল ব্যক্তিমানুষ ও তার অস্তিত্ব। ভাববাদী দর্শনের হাত থেকে মানুষ আবার মুক্তি পেল মার্ক্স্-বাদের প্রসার ও প্রচারের ফলে। মার্ক্সীয় দর্শনে মানুষ পেল বাস্তবের আস্বাদ। মার্ক্সের পর ধীরে ধীরে নানা কারণে মার্ক্সবাদেও দেখা গেল সমষ্টিবাদের প্রাধান্য, ব্যক্তিমানুষ হারিয়ে ফেলল তার স্বাধীনতা। ব্যক্তি তার ব্যক্তিসত্তা বিসর্জন দিয়ে গোষ্ঠীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে মানব-অস্তিত্বের সংকট ও সমস্যা হয়ে পড়ে আরো তীব্র। যান্ত্রিক সভ্যতার প্রসার এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রয়োগের ফলে ধীরে ধীরে মানুষ হয়ে পড়ল যন্ত্রের দাস। অনাচার, ভণ্ডামী, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, রাজনীতির সর্বগ্রাসী চরিত্র—সব কিছু মিলে মানুষকে করে তুলল বিপন্ন। কেবল পাশ্চাত্ত্যে নয়, গোটা পৃথিবী জুড়ে চলছে এক অরাজকতা ও অস্থিরতা। চারদিকে শুধু সমস্যা আর সংকট। আর এ সংকট শুধু অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সাংস্কৃতিক, নৈতিক এবং বৌদ্ধিক জগতেও তা প্রকট। একটা প্রচণ্ড অর্থহীনতা আজ মানব-সমাজের ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দিচ্ছে।

এ যাবৎকাল বিষয়গত দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ ও জগৎ-কে দেখেছেন দার্শনিকরা। ফলে গতানুগতিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনের বিমূর্তায়নের মধ্যে মানুষ খুঁজে-পায় নি তার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, হতাশা, উদ্বেগ, মনস্তাপ, বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্ব, প্রভৃতি যা মানব-অস্তিত্বের একান্ত অপরিহার্য অঙ্গ।

প্রকৃতিবাদ মানুষকে জড় জগতের অংশে পরিণত করেছে, মানুষকে করে তুলেছে যান্ত্রিক নিয়মের অধীন। ভাববাদের মতো প্রকৃতিবাদেও ব্যক্তি-

স্বাধীনতার কোন স্থান নেই। অন্যদিকে, সমষ্টিবাদ ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা, তার সত্তা, তার আন্তর বৃত্তিসমূহের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের সম্ভাবনাকে নিষ্পেষিত করেছে, তার স্বাভাবিক অগ্রগতিকে করেছে ব্যাহত। মার্কস্‌বাদ নিঃসন্দেহে মানুষকে আলো দেখিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে, পথের সন্ধান দিয়েছে, দৃষ্টিভঙ্গীর ঘটিয়েছে অনেক পরিবর্তন, কিন্তু নানাদেশে মার্কস্‌বাদ নানা-ভাবে ব্যাখ্যাত হওয়ার ফলে মানুষ শেষ পর্যন্ত সঠিক পথের সন্ধান পায় নি। বোধ করি সেজন্যই জাঁ-পল সার্ত্র্ মার্কস্‌বাদকে 'এ যুগের শ্রেষ্ঠ দর্শন' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েও মার্কস্‌বাদের কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে বজায় রাখতে চেয়েছেন।

গতানুগতিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনের পদ্ধতি, নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী, বিষয়গততা ও সারধর্মবাদের বিরুদ্ধে ইউরোপের মাটিতে তাই জন্ম নিয়েছে অস্তিবাদ—এক জ্বলন্ত বিদ্রোহ হিসেবে। ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষ অবলম্বন করে, এবং সকল রকম নিয়ন্ত্রণবাদের বিরোধিতা করে অস্তিবাদ বিষয়ীগত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মানুষ ও তার জগৎকে দেখতে শেখাল। ধীরে ধীরে অবশ্য পরিস্থিতি অনুযায়ী অস্তিবাদেরও রূপ পাল্টেছে। সেজন্যই আমরা দেখি কোন কোন অস্তিবাদী আস্তিক, আবার কেউ কেউ নাস্তিক। সার্ত্র্ তো শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রথমদিকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী প্রবণতাকে সমালোচনা করে সমাজতান্ত্রিক পূর্ণ মানুষের কথা বলেছেন। অস্তিত্ব কোন কিছুর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত নয়। মানুষ সব সময়ই স্বাধীন, আর এই স্বাধীনতাকে কোন অবস্থায় কোন মূল্যেই বিকিয়ে দেওয়া চলে না। আসলে, দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর ইউরোপের শিক্ষিত যুবসমাজ যখন সুনির্দিষ্ট কোন মূল্যবোধের অভাবে, বাস্তব দর্শনচিন্তা ও কর্মকাণ্ডের অভাবে, বিরাট শূন্যতার বেদনায় পিষ্ট হয়ে লক্ষ্যহীনভাবে বিভ্রান্ত হয়ে জীবন কাটাচ্ছিল, তখন তারা এল অস্তিবাদের সংস্পর্শে, বিশেষ করে সার্ত্র্-এর অস্তিবাদের। স্বভাবতই ইউরোপের মানুষ এই ব্যবহারিক দর্শনকে স্বাগত জানিয়েছে, এবং পরবর্তী-কালে এই আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছেছে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও। স্বীকার করতেই হবে যে, অস্তিবাদী রচনায় আছে আন্তরিকতার সুর ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রকাশ, যা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে অস্তিবাদীদের সাধুতা ও সাহসে। কিছু অসংগতি, ও আত্মবিরোধ থাকা সত্ত্বেও অস্তিবাদীরা যে-সমস্ত সমস্যাবলীর কথা বলেছেন তা নিঃসন্দেহে দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যৎ মানুষের দর্শন রচনায় অস্তিবাদের মূল্য অপরিসীম।

দ্য ক্রিটিক অব্ ডায়েলেক্টিক্যাল রীজন
উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু

সার্ত্র্-এর 'দ্য ক্রিটিক অব ডায়েলেক্টিক্যাল 'রীজন' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে। ঐ গ্রন্থে তিনি অস্তিবাদী ধারা অনুসরণ করলেও গ্রন্থটির বক্তব্য কিছুটা অপ্রত্যাশিত। সার্ত্র্-এর বক্তব্য হলো, মার্কস্বাদই বস্তুতঃ বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ দর্শন। এই বক্তব্য অপ্রত্যাশিত এজন্য যে, ব্যক্তিস্বাধীনতার একজন কট্টর প্রবক্তা হয়েও সার্ত্র্ শেষ পর্যন্ত মার্কস্বাদকেই এ যুগের শ্রেষ্ঠ দর্শনের স্বীকৃতি দিয়েছেন, ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিবর্তে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেই চরম লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। সার্ত্র্-এর দৃঢ়বিশ্বাস, মার্কস্বাদ এ যুগের শ্রেষ্ঠ দর্শন, আর মার্কস্বাদের কাঠামোর মধ্যে সৃষ্ট অস্তিবাদ হলো একটি ভাবাদর্শ বা ইডিয়লজি। ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'দ্য কোশ্চেন অব্ মেথড্' শীর্ষক প্রবন্ধে [১] সার্ত্র্ 'দর্শন' এবং 'ভাবাদর্শ'-এর উল্লেখ করে বলেছেন যে, 'প্রতিটি যুগে মাত্র একটি-ই প্রধান দর্শন থাকে, আর ঐ দর্শনের ছত্র-ছায়ায় গড়ে ওঠে অনেক ভাবাদর্শ। যে কোন দার্শনিকই, তা তিনি উপলব্ধি করুন আর নাই করুন, এবং যুগের প্রধান দর্শনের পক্ষে বা বিপক্ষে যে দিকেই থাকুন না কেন, বাস্তবে তাই লিখবেন যা ঐ প্রধান দর্শনের আলোকে বোধগম্য হবে। দর্শনের

---

১. প্রবন্ধটি প্রথমে ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে পোল্যাণ্ডের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'দ্য সিচুয়েশন অব একজিস্টেনসিয়েলিজম্ ইন নাইনটিন ফিফটিসেভেন নামে প্রকাশিত হয়। পরে তা 'লে মদার্ন পত্রিকায় একজিস্টেনসিয়েলিজম্ অ্যাণ্ড মার্কসীজম্ নামে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে বই-এর আকারে যখন তা প্রকাশিত হয়, তখন এর ইংরাজী নামকরণ করা হয় 'সার্চ ফর অ্যা মেথড'।

ক্ষেত্রে অস্তিবাদী বিশ্ববীক্ষার নিশ্চয়ই একটা অবদান আছে, তবে ঐ অবদানের তাৎপর্য নিহিত আছে মার্কসীয় তত্ত্বের কোন না কোন দিককে আলোকিত, গভীর ও প্রাণবন্ত করার মধ্যেই।'

সার্ত্‌র্‌-এর বহু-বিতর্কিত 'ক্রিটিক' গ্রন্থটির উদ্দেশ্য হলো মার্কস্‌বাদ ও অস্তিবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং নতুন একটি সামাজিক মতবাদ বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপিত করা। 'বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস্‌' গ্রন্থের শেষের দিকে সার্ত্‌র্‌ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থ রচনা করবেন এবং গ্রন্থটির তৃতীয় অধ্যায় বা খণ্ডের পাদটীকায় অন্যান্যদের সংগে আমাদের সম্পর্কের অর্থহীন স্বরূপের আলোচনা প্রসংগে লিখেছেন, "এই সমস্ত আলোচনা মুক্তির নীতিশাস্ত্রের সম্ভাবনাকে খণ্ডন করে না। কিন্তু তা লাভ করা যেতে পারে একমাত্র আমূল রূপান্তরের ফলে, যা এখানে আমরা আলোচনা করতে পারি না…।" একথা সন্দেহাতীত যে 'আমূল রূপান্তর' বলতে 'মার্কস্‌বাদে রূপান্তর'-কেই বোঝানো হয়েছে, এবং নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় যে গ্রন্থ রচনার প্রতিশ্রুতি ছিল সেই গ্রন্থটিই সার্ত্‌র-এর 'ক্রিটিক' গ্রন্থটি। প্রসংগত বলে রাখা প্রয়োজন যে, যদিও সার্ত্‌র্‌ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থ রচনা করবেন, আসলে তিনি যা রচনা করেছেন তা সমাজতত্ত্ব সম্পর্কিত গ্রন্থ। 'ক্রিটিক' গ্রন্থটিতে সার্ত্‌র্‌-এর প্রধান কাজ হলো মানুষ সম্পর্কিত সমস্ত ভবিষ্যৎ চিন্তার একটি ভিত্তি স্থাপন করা; সংক্ষেপে, নৃবিজ্ঞানের একটি ভিত্তি স্থাপন করা।

'ক্রিটিক' গ্রন্থে সার্ত্‌র্‌ কিয়েকের্গার্দ ও য়্যাস্পার্সকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, "এঁরা উভয়েই ইউরোপীয় বুর্জোয়াতন্ত্রের অংশ, যা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক অভিজাততন্ত্রের দাবীতে তার অধিকারকে সমর্থন করে, এবং যা অত্যুৎকৃষ্ট বা শুদ্ধ বিষয়ীগততায় নিমজ্জিত হয়ে ভবিষ্যৎকে উপেক্ষা করে অনবদ্য বর্তমানের দ্বারা বিমোহিত হতে চায়…।"

সার্ত্‌র্‌ তাঁর 'ক্রিটিক' গ্রন্থে দুটি সিদ্ধান্তে এসেছেন, যথা, (১) মার্কস্‌বাদই আমাদের যুগের যথার্থ ও শ্রেষ্ঠ দর্শন এবং (২) মার্কস্‌বাদ-বিরোধী তত্ত্বকে হয় প্রাক্‌-মার্কসীয় যুগের ধারণায় ফিরে যেতে হবে, আর না হয়, মার্কস্‌বাদ কর্তৃক সমালোচিত ও খণ্ডিত ধারণার পুনরাবিষ্কার করতে হবে। ব্যক্তির স্বাধীনতা ও কর্মোদ্যমকে মার্কসীয় কাঠামোর মধ্যে রেখে সার্ত্‌র্‌ 'অস্তিবাদী মার্কস্‌বাদ' প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

বিশ্বের কোন কোন রাজনৈতিক মহল থেকে সার্ত্‌র্‌-কে 'শোধনবাদী' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। শোধনবাদ সম্পর্কে এক সময় সার্ত্‌র্‌ বলেছেন, হয় তা সত্য, আর না হয়, অবাস্তব। নির্বিচারবাদী মার্কস্‌বাদের বিরুদ্ধে যখন মার্কসীয় ধারণার বিবর্তনের কথা বলা হয়, তখন তা সত্য। যাঁরা মার্কস্‌বাদের বিশ্বস্ত সমর্থক তাঁদের কাছে মার্কসীয় ধারণাসমূহের বিবর্তন অবশ্য স্বীকৃত তথ্য। মার্ক্‌স্‌বাদ, সার্ত্‌র্‌-এর মতে, একটি প্রাণবন্ত ব্যবহারিক তত্ত্ব, যা সামাজিক অগ্রগতির সংগে তাল রেখে পরিবর্তিত হয়, বিকশিত হয়। কিন্তু মূল দর্শনে পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হলে শোধনবাদ অবাস্তব হয়ে পড়ে।

গোঁড়া মার্কসীয় অর্থনীতির দ্বারা নয়, বরং নৈতিক কারণে আকৃষ্ট হয়েই সার্ত্‌র্‌ মার্কস্‌বাদকে জীবনবেদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, মার্ক্‌স্‌বাদ একটি ব্যবহারিক দর্শন। যুদ্ধোত্তর সংকট ও অত্যাবশ্যকতার চাপে পিষ্ট বহু বুদ্ধিজীবী তরুণদের এই দর্শন আলো দেখিয়েছে, পথের সন্ধান দিয়েছে, অগণিত মানুষকে কর্মে উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছে। এই দর্শন আশাবাদী দর্শন। মার্কসের মতো সার্ত্‌র্‌ও কর্মের দর্শনে আগ্রহী। যদিও তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'ওয়ার্ডস্‌'-এ বলেছেন "বই-এর মধ্যেই আমার জীবন শুরু, আর এটা নিশ্চিত যে জীবনটা শেষ করব বই-এর মধ্যেই", তবু তিনি কখনই গজদন্তের মিনার-বিহারী দার্শনিক ছিলেন না। তাঁর জীবন ও কীর্তিই এর প্রমাণ।

জীবনের গোড়ার দিকে সার্ত্‌র্‌ ব্যক্তি-বিশেষের অস্তিত্ব নিয়েই বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি বারবার বলেছেন যে, কোন পর্যাপ্ত অস্তিবাদী বিশ্লেষণ অস্তিত্বের সামাজিক দিককে বা চরিত্রকে উপেক্ষা করতে পারে না, কারণ, মানুষ একান্তভাবেই 'সামাজিক জীব'। সমাজে ব্যক্তির অস্তিত্ব আবশ্যিকভাবে অন্যান্যদের অস্তিত্বকে সূচিত করে। এ প্রসংগে মনে রাখা দরকার যে, সার্ত্‌র্‌ মার্কস্‌বাদের প্রভাবেই সমাজতান্ত্রিক মানুষের কথা বলার প্রেরণা পেয়েছেন। তিনি মনে করতেন যে, মানব-অস্তিত্বের সামাজিক দিকটির যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণ দরকার, এবং তা করতে হবে ইতিহাস পাঠের আলোকে। ইতিহাস ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই মানব-অস্তিত্বকে বুঝতে হবে। উনিশ শতকের শেষার্ধে একদল চিন্তাবিদ্‌ মানবজীবন ও চিন্তার, এক কথায় অস্তিত্বের, ঐতিহাসিক চরিত্রের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দর্শনের ইতিহাসে তাঁরা সাধারণতঃ 'অস্তিবাদী' হিসেবে পরিচিত নন। এঁদের মধ্যে উইলহেল্‌ম্‌ ডিল্‌থের নাম বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। ইতিহাস সম্বন্ধে সমকালীন অস্তিবাদী চিন্তাধারার ওপর ডিল্‌থের প্রভাব অপরিসীম। তাঁর মতানুসারে, ইতিহাস একটি মানবিক বিষয়, এবং ইতিহাস পাঠকে মানবিক বিজ্ঞান হিসেবেই চিহ্নিত করতে হবে। ইতিহাসকে মানবিক বিষয় বলার অর্থ হলো, 'ইতিহাস' ও 'ঘটনা'-র (বা প্রক্রিয়া) মধ্যে পার্থক্য করা। ঘটনা প্রাকৃতিক, কার্যকারণ নিয়মের দ্বারা প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা কিছুটা ভিন্ন ধরনের; ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে মানবিক প্রতিনিধির (Human agency) দ্বারা। এই প্রতিনিধি হতে পারে মানুষের উচ্চাশা, হতে পারে ক্ষুধা, ভয বা আক্রমণ, কিংবা হতে পারে ভালোবাসা, ঘৃণা অথবা কোন সংকল্প। ডিল্‌থের মতে, ইতিহাস পাঠ অস্তিত্বসূচক ভাবেই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সার্ত্‌র্‌-এর 'দ্য ক্রিটিক অব্‌ ডায়েলেকটিক্যাল রীজন' গ্রন্থটি শুরু হয়েছে একটি ভূমিকা দিয়ে, যার সংগে কাণ্টের 'ক্রিটিক অব্‌ পিওর রীজন' গ্রন্থটির ভূমিকার আকারগত সাদৃশ্য রয়েছে। সম্ভবতঃ ঐ আকারগত সাদৃশ্যকে লক্ষ্য করেই মেরী ওয়ারনক্‌ বলেছেন, 'দ্য ক্রিটিক অব্‌ ডায়েলেকটিক্যাল রীজন' নামটি কাণ্টীয়। ঐ গ্রন্থে সার্ত্‌র্‌-এর মনোভাবের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় সুস্পষ্টভাবেই—ব্যক্তিকেন্দ্রিক সত্তাবিজ্ঞানের (individual ontology) চেয়ে সমাজবিজ্ঞান ও সমাজদর্শনেই তাঁর আগ্রহ দেখা যায় বেশী। মানুষকে ব্যক্তিবিশেষ হিসেবে নয়, কোন একটি শ্রেণীর সভ্য হিসেবেই গণ্য করা সংগত বলে সার্ত্‌র্‌ মনে করেছেন, জগতের সংগে যাদের সম্পর্কের মাধ্যম হচ্ছে কর্ম। বস্তুত এক যুগ ধরে সঞ্চিত বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও নৈতিক অন্তর্দৃষ্টিকে একত্রিত করে সার্ত্‌র্‌ কীভাবে ধীরে ধীরে একটি সমাজ-দর্শন গড়ে তুলেছেন, 'ক্রিটিক' গ্রন্থটি তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

সার্ত্‌র্‌-এর 'ক্রিটিক' গ্রন্থটির দুটি অংশ বা অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়টি ছোট। নাম 'সার্চ ফর অ্যা মেথড'। দ্বিতীয় অধ্যায়টি অনেক বড়ো। নাম 'দ্য থিওরী অব্‌ প্র্যাকটিক্যাল এনসেম্‌ব্‌ল্‌স্‌'। প্রথম অধ্যায়টি ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে লিখিত এবং একটি পোলিশ সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের পরিবর্ধিত রূপ।

গ্রন্থটির ভূমিকায় সার্ত্‌র্‌-এর উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সার্ত্‌র্‌-এর কাছে প্রশ্ন ছিল: "আমাদের কি একটি গঠনগত, ইতিহাসগত নৃবিজ্ঞান (Structural, Historical Anthropology) তৈরি করার উপায় বা পথ আছে? এই প্রশ্নটি সার্ত্‌র্‌ প্রথম ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে

তাঁর 'লে তঁ মদার্ন' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন। সেখানে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একটি সংশ্লেষক নৃবিজ্ঞান (synthetic Anthropology) গড়ে তোলা। সার্ত্র্-এর 'ক্রিটিক' গ্রন্থটি দ্বান্দ্বিক চিন্তাপদ্ধতি হিসেবে মার্ক্স্বাদের সীমা নির্দেশ করতে চেয়েছে এবং তাকে স্তালিনবাদের কবলমুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছে। এই চিন্তাধারাই, সার্ত্র্-এর মতে, ইতিহাসগত নৃবিজ্ঞান তৈরি করবে।

তাঁর মতবাদ প্রবর্তন করতে গিয়ে সার্ত্র্ ঘোষণা করেছেন যে, মার্ক্স্বাদ হলো একটি প্রাণবন্ত দর্শন, 'আমাদের যুগের শ্রেষ্ঠ দর্শন'। এই দর্শনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও শ্রদ্ধা জানাতে তিনি কখনও কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

সার্ত্র্-এর মতে, মার্ক্স্বাদ আমাদের ধ্যান-ধারণার রূপান্তর ঘটিয়েছে এবং বুর্জোয়া চিন্তাভাবনার মূলে আঘাত করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সার্ত্র্ মনে করেন যে, মার্ক্স্বাদ অস্তিবাদী সমস্যাবলীর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে পারে নি। সেজন্যই মার্ক্স্বাদ 'এ যুগের শ্রেষ্ঠ দর্শন' হলেও, সার্ত্র্-এর মতে, অস্তিবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, আর তা হলো মার্ক্স্বাদকে 'পূর্ণায়িত' করে তোলা। মার্ক্স্বাদ যদি মানবিক মাত্রাগুলিকে (human dimensions), অর্থাৎ অস্তিবাদী কর্মসূচীকে, নৃবিজ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে, তাহলে অস্তিবাদের আর প্রয়োজন থাকে না। অস্তিবাদের ভূমিকা ক্ষুদ্র হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একমাত্র অস্তিবাদই পারে মার্ক্স্বাদকে গভীর, আলোকিত ও প্রাণবন্ত করে তুলতে। বোধ করি সেজন্যই তিনি অস্তিবাদকে সমস্ত মার্ক্সীয় বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রাখতে চেয়েছেন।

সার্ত্র্ সমকালীন মার্ক্স্বাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন দুটি অংশে। প্রথমতঃ 'সার্চ ফর্ অ্যা মেথড'* অংশে ঐতিহাসিক জড়বাদ (বস্তুবাদ) হিসেবে মার্ক্স্বাদের বিচার করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, 'দ্য থিওরী অব্ প্র্যাক্টিক্যাল এনসেম্ব্ল্স্'* অংশে তিনি দ্বান্দ্বিক জড়বাদ (বস্তুবাদ) হিসেবে মার্ক্স্বাদের বিচার করেছেন। 'সার্চ ফর অ্যা মেথড্'-এ সার্ত্র্-এর উদ্দেশ্য ছিল ইতিহাসগত বিশ্লেষণের একটি নতুন পদ্ধতি তৈরি করা, আর 'দ্য থিওরী অব্ প্র্যাক্টিক্যাল এন্সেম্ব্ল্স্'-এ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল

* Question de methode.

* Theorie des ensembles pratiques.

দ্বান্দ্বিক যুক্তির সীমা নির্ধারণ করা এবং এটা দেখানো যে, একমাত্র দ্বান্দ্বিক যুক্তিই ইতিহাসকে বোধগম্য করে তুলতে পারে।

সার্ত্‌র্‌-এর অস্তিবাদী মার্কস্‌বাদের শ্লোগান হলো 'মার্কস্‌বাদের সাহায্যে মানুষকে আবার জয় করা' (To reconquer man with Marxism)। সার্ত্‌র্‌-এর কাছে সমকালীন মার্কস্‌বাদ একটি বিমূর্ত সূত্র বা ফরমুলার মতোই, যা অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রক (economic determinants) এবং মূর্ত কর্মের গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতাকে বা সংযোগ রক্ষাকে (Mediation) উপেক্ষা করেছে। মার্কস্‌বাদের দরজা মনঃসমীক্ষণ প্রভৃতি শাস্ত্রের কাছে উন্মুক্ত থাকুক—এটাই ছিল সার্ত্‌র্‌-এর ইচ্ছা। 'সার্চ ফর অ্যা মেথড্‌'-এ সার্ত্‌র্‌ বলেছেন, আজকের মার্কস্‌বাদীরা পরিণত বয়স্কদের নিয়ে ব্যস্ত, অথচ শিশু হিসেবেই পরিবারে মানুষ প্রথম তাদের অনন্বয় বা চ্যুতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করে। পরিণত বয়স্কের অর্থনৈতিক ক্রিয়া বিশ্লেষণের আগে প্রয়োজন সমাজস্থ জীব হিসেবে একটি শিশুর পারিবারিক সম্পর্কের অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ করা। প্রতিটি স্তরের অভিজ্ঞতারই নিজস্ব একটা শক্তি আছে। বিভিন্ন সমাজ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে এর বিচার করতে হবে। 'ভিত্তি বা কাঠামো (base) এবং পরিকাঠামো (Super structure)' সূত্রে বা ফরমুলায় রূপান্তরিত করার আগেই মার্কসীয় মতবাদকে ঐ সমস্ত আকার বা গঠনগুলিকে (structures) তাদের বিশেষ বিশেষ রূপে বিচার করতে হবে।"[২] মধ্যস্থতার বা সংযোগরক্ষার (Mediation) সমস্যা শেষ পর্যন্ত সার্ত্‌র্‌-কে একটি সামাজিক-ঐতিহাসিক বিশ্লেষণী পদ্ধতির প্রবর্তক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সার্ত্‌র্‌ বলেছেন যে, তাঁর 'ক্রিটিক' গ্রন্থটির মূল সুর অর্থনৈতিক নয়, সমাজ-বৈজ্ঞানিক। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সার্ত্‌র্‌-এর প্রশ্ন ছিল 'আমি কী করব ?' কিন্তু ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের পর দেখা গেল 'আমরা কী করব ?'—এটাই সার্ত্‌র্‌-এর প্রশ্ন। ব্যক্তি চিন্তা থেকে সমাজ-চিন্তায় এই যে উত্তরণ সার্ত্‌র্‌-এর দর্শনে আমরা দেখতে পাই, তা মার্কসীয় দর্শনের প্রভাবেরই ফল। অন্য কারণও আছে। প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা, এবং-সমস্যা জর্জরিত যুদ্ধোত্তর দিনগুলির অভিজ্ঞতা সার্ত্‌র্‌-কে সম্মিলিত কাজের এবং যৌথ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। ঐ সময় সার্ত্‌র্‌-এর কাছে ব্যক্তিস্বার্থ যেন অনেকটা গৌণ ; সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘবদ্ধতা বা ঐক্যবোধই মুখ্য হয়ে উঠেছিল।

২. Mark Poster, Existential Marxism in Post-war France.

তাঁর লক্ষ্য বিপ্লব, ব্যক্তিগত বিদ্রোহ নয়। সুস্পষ্টভাবে তিনি ঘোষণাও করেছেন যে, মানুষকে ব্যক্তি হিসেবে বিচার না করে কোন শ্রেণীর সভ্য হিসেবেই বিচার করা অধিকতর যুক্তিসংগত এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে সত্য। আদিমতম মনোনয়নের (Choice) স্বাধীনতা হলো 'দল' গঠনের স্বাধীনতা, এবং দল, গোষ্ঠী বা শ্রেণীকে পরবর্তীকালে বজায় রাখার প্রচেষ্টাও মনোনয়নের স্বাধীনতাকেই সূচিত করে। 'ক্রিটিক' গ্রন্থটির উদ্দেশ্যও দলের বা গোষ্ঠীর উৎপত্তি ও রক্ষণের বিশ্লেষণ করা। সার্ত্র্-এর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ব্যক্তি চেতনা সম্পর্কিত মতবাদ থেকে ধীরে ধীরে সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রাক্সিস্ সম্পর্কিত মতবাদে সরে এসেছিল। কর্মের মাধ্যমেই মানুষ সংঘবদ্ধ হয় এবং বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী গঠন করে—এই চিন্তাই সার্ত্র্-কে সামাজিক-ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ব্যক্তিকে বিচার করার প্রেরণা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনি গ্রহণ করেছেন একটি সমাজদর্শনকে।

'ক্রিটিক' গ্রন্থটির দীর্ঘ অধ্যায় 'দ্য থিওরী অব্ প্র্যাক্‌টিক্যাল এন্‌সেম্-বল্‌স্'—এ সার্ত্র্ দ্বান্দিক যুক্তির সীমা নির্দেশ করতে চেয়েছেন এবং মার্কস্‌বাদকে 'ডগ্‌মা'-র কবলমুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি সেখানে কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেগুলির অর্থ না জানলে সার্ত্র্-এর বক্তব্যের সম্যক অনুধাবন সম্ভব নয়। শব্দগুলির মধ্যে 'বহুত্বায়ন' বা 'সমগ্রীকরণ' (Totalisation) এবং 'প্রাক্সিস্' (Praxis) বা কর্মপ্রকল্প উল্লেখযোগ্য। সমগ্রীকরণ হলো যে কোন ঐক্যবিধায়ক (unifying) বা সংগঠনী ক্রিয়া, যা অংশকে সমগ্রের অংশ হিসেবে গণ্য করে; আর ঐ সমগ্রটি সদাই গতিশীল। সমগ্রীকরণের ধারণা দ্বান্দিকতার কেন্দ্রবিন্দু। সমগ্রীকরণের ফল হলো 'সমষ্টি' বা 'সমগ্রতা' (Totality)। এই 'সমষ্টি'র বা 'সমগ্রতা'র ধারণা সার্ত্র্-এর 'ক্রিটিক'-এর প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয়ার্ধে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, যদিও সেখানে ধারণাটির অর্থ ও তাৎপর্য স্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়নি। সেখানে বলা হয়েছে, কোন অভাব পূরণের জন্য এই জগতে ব্যক্তির ক্রিয়া কোন পরিবর্তনকে সূচিত করে, যাকে ব্যক্তির অভিপ্রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে 'সমগ্র' ভাবে বিচার করা চলে। অর্থাৎ, সেখানে দ্বান্দিকতার উদ্ভব হয় পরিস্থিতিকে 'সমগ্র'ভাবে দেখার ব্যক্তির 'পরিকল্পনা' (Project) গ্রহণের এবং তাকে অতিক্রমণ করার সামর্থ্যের মাধ্যমে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে সার্ত্র্ আরো স্পষ্টভাবে তা ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, সকল ব্যক্তির ক্রিয়া যৌথ ক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়ে একটি পরিবর্তিত পরিবেশ তো রচনা করেই, উপরন্তু তা এমন পরিবেশের সৃষ্টি করে যেখানে

বিভিন্ন ব্যক্তি একাত্মতা অনুভব করে এবং যার ফলে একটি 'দল' বা 'গোষ্ঠী'-র সৃষ্টি হয়, যেখানে সকলের লক্ষ্য এক। এক উদ্দেশ্যমুখী এই যে সংগঠন সৃষ্টি, তাই হলো দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার লক্ষ্য। দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি সুসংগঠিত সমাজ প্রতিষ্ঠায় সার্ত্র্‌ ছিলেন আগ্রহী। তাঁর কাছে সমগ্রীকরণ হলো দ্বান্দ্বিকতার লক্ষ্য।

সার্ত্র্‌ তাঁর 'ক্রিটিক' গ্রন্থে আরো বলেছেন যে, মানুষের কর্মকে বোঝা যেতে পারে একমাত্র সমগ্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতেই। 'সমগ্রীকরণ' আর 'সমষ্টি'র মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, সমষ্টি হলো অনড়, নিষ্ক্রিয়, আর সমগ্রীকরণ হলো একটি জীবন্ত প্রক্রিয়া। প্রতিটি কর্মই অর্থের (Meaning) একটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রকে চিত্রিত করে। দ্বান্দ্বিকতা ব্যক্তির কর্মের বা ক্রিয়ার অর্থকে তার বৃহত্তর সামাজিক গণ্ডীর সংগে সম্পর্কের মাধ্যমেই পরিস্ফুট করে। ব্যক্তি যেমন তার ক্রিয়া বা কর্মকে সমগ্রীকরণ করে তেমনি অন্যান্য ব্যক্তির দ্বারাও তার কর্মের সমগ্রীকরণ ঘটে। সার্ত্র্‌ মনে করতেন যে, একমাত্র দ্বান্দ্বিক যুক্তিই সমগ্রীকরণকে বুঝতে পারে, আর বিশ্লেষণী যুক্তি সমষ্টিকে বোঝার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশ্লেষণী যুক্তিতে সমগ্রীকরণের পারস্পরিক সম্পর্কটি ধরা পড়ে না, কেননা, এই ধরনের যুক্তি সবসময়ই তার বিষয়কে বিচ্ছিন্ন করে দেখে। এই ধরনের যুক্তি বা চিন্তা দ্বান্দ্বিকতা বিরোধী ঘটনার (anti-dialectical phenomena) আলোচনা করতে পারে, যেখানে মানুষ এবং সংস্থা (institution) যান্ত্রিক বিষয় হিসেবে উপস্থিত হয়। বিশ্লেষণী যুক্তির সিদ্ধান্তকে সবসময়ই সংহত (integrated) করতে হয়, কেননা, কোন সামাজিক ঘটনাই, তার সত্তা-বিজ্ঞানগত (ontological) উৎপত্তির দিক থেকে, শুধুমাত্র বস্তু নয়, তা সেটি দ্রষ্টা বা ঐতিহাসিক অংশগ্রহণকারীর (historical participant) কাছে যতোই অনড় বা নিষ্ক্রিয় মনে হোক্‌ না কেন। কোন বিশেষ মুহূর্তে মানবিক কর্মগুলি বিচ্ছিন্ন এবং সম্পর্কহীন হিসেবে উপস্থিত হলেও প্রতিটি কর্মের আভিমুখ্যতার (intentionality) পরিপ্রেক্ষিতে সমষ্টির সংশ্লেষণের দিকে একটি প্রবণতা বা ঝোঁক দেখা যায়, আর তাকেই সার্ত্র্‌ বলেছেন সমগ্রীকরণ। দ্বান্দ্বিকতা দৈনন্দিন বা প্রাত্যহিক জীবনের অভিমুখী কর্ম-সমূহের বিষয়ীগত দিককে উন্মোচন করে। সার্ত্র্‌-এর 'সমগ্রীকরণ'-এর ধারণাটি তাঁর 'বিয়িং অ্যাণ্ড নাথিংনেস্‌-এর 'পরিস্থিতি'র ধারণাকে আরো গভীর ও তাৎপর্যময় করে তুলেছে। ব্যক্তির মনোনয়ন যে একটি সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতকে সূচিত করে এবং ব্যক্তির মনোনয়নকে বোঝার পক্ষে

সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত যে আবশ্যিক শর্ত সার্ত্র্ তা 'ক্রিটিক' গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপেই ঘোষণা করেছেন। 'বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস্' গ্রন্থের 'পরিকল্পনা'র (Project) আপেক্ষিকতা সার্ত্র্-এর 'সমগ্রীকরণ'-এর ধারণা বা প্রত্যয়ের দ্বারা অনেকটাই খণ্ডিত। 'পরিকল্পনা' যেহেতু সমগ্রীকরণ-কে সূচিত করে, তাই এর অর্থ ইতিহাসের সংগে জড়িত, যা পরিকল্পনা সমূহের বহুত্বকে ক্রমানুসারে সাজিয়ে একটি সার্বিক একীকরণের রূপ দিয়ে ঘটনাসমূহের ঐতিহাসিক দিক নির্দেশ করে দেয়। মানবিক পরিকল্পনাসমূহ শেষ পর্যন্ত একটি সমগ্রীকরণের সংগে জড়িত বা সম্পর্কিত, আর ইতিহাস সেদিকেই অংগুলী নির্দেশ করে।

সার্ত্র্ -এর দর্শন সযত্নে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, সমগ্রীকরণের ধারণার দ্বারা তিনি তাঁর আগেকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী প্রবণতাকে জয় করতে সমর্থ হয়েছেন। কেননা, দ্বান্দ্বিক যুক্তি চিন্তাকারীর স্বয়ং-সম্পূর্ণ (self-contained) ও বিচ্ছিন্ন চরিত্রের সমগ্রীকরণকে সূচিত করে। সার্ত্র্-এর ভাষায়, "যদি ইতিহাসের ঐক্য বলে কিছু থাকে, তাহলে অনুসন্ধানকারী নিজের জীবনকে একীকরণের দ্বান্দ্বিক অগ্রগতিতে 'সমগ্র' এবং 'অংশ' হিসেবে উপলব্ধি করবে, উপলব্ধি করবে অংশ এবং সমগ্রের যোগসূত্র হিসেবে, এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্বন্ধ হিসেবে। তার নিজের জীবন থেকে ইতিহাসের দিকে ঝাঁপ দিতে তাকে সমর্থ হতেই হবে...।"*

কোন কোন সমালোচক বলেছেন যে, সার্ত্র্ দেকার্তের 'আমি' বা 'আত্মা' (cogito) থেকে মুক্ত হতে পারেন নি, কারণ, তিনি এখনও 'বিষয়ী'র কথা বলছেন, 'ব্যক্তি'-র ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু সার্ত্র্ এই অভিযোগের উত্তরে বলেছেন যে, তাঁর ক্রিটিক' গ্রন্থটি তো মূলতঃ ব্যক্তি-জগৎ ও সামাজিক-জগতের সম্পর্ক নিয়েই আলোচনা।

'সমগ্রীকরণ'-এর ধারণাটি সার্ত্র্-এর 'ক্রিটিক' গ্রন্থের প্রথম নীতি। পরবর্তীকালে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের সূত্রে আরো কিছু ধারণা বা প্রত্যয়ের ব্যবহার 'সমগ্রী-করণ'-এর ধারণাটিকে আরো মূর্ত করে তুলেছে। যে দ্বান্দ্বিক নীতি ঐ সম্পর্ক সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে তা হলো, মানুষ ও বস্তু একে অন্যের সংগে সম্পর্কিত এবং একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত।

*. **R. D. Cumming, The Philosophy of Jean-Paul Sartre.**

'প্রাক্সিস্' বা কর্মপ্রকল্প প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে সার্ত্র্ বলেছেন যে, 'সমষ্টি'র ব্যবহারই (use of totalities) প্রাক্সিস্। প্রাক্সিস্ বা কর্ম-প্রকল্প হলো জাগতিক পরিস্থিতিতে উদ্দেশ্যমূলক মানবিক ক্রিয়া। মার্কস্ বৈজ্ঞানিকের ভূমিকা গ্রহণ করে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপরে গড়া পুঁজিপোষ্য সমাজে পরিপূর্ণতার অবকাশ নেই। কাজেই এই সমাজের শুধু ব্যাখ্যা দিলেই চলবে না, সমাজ ব্যবস্থাটাকে পাল্টাতে হবে। সমাজ ব্যবস্থার অসম বিন্যাসের পরিবর্তন সাধন করতে হবে। মার্কস্ সমাজ-রূপান্তরের এই কর্মকাণ্ডের নাম দিয়েছিলেন 'প্রাক্সিস্'। মার্কসের প্রভাবে সার্ত্র্ তাঁর 'ক্রিটিক' গ্রন্থে বহুবারই 'প্রাক্সিস্' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, প্রাক্সিস্ হলো মানবিক কর্ম। এই মানবিক কর্ম আবশ্যিকভাবে দুটি অংশকে সূচিত করে। প্রথম অংশটি হলো একটি বিষয়ীগত পরিকল্পনা বা নক্সা (Project or Plan), যা ব্যক্তি তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, পরিস্থিতি, উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজন বা অভাব সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে গঠন করে। আর দ্বিতীয় অংশটি হলো বিষয়গত বাস্তব পরিস্থিতি যার মধ্যে মানুষ বাস করে, দৈনন্দিন জীবন নির্বাহ করে, এবং যা সে পাল্টাতে চায়। না- চাওয়া বর্তমানের বাস্তব পরিস্হিতিব উত্তবণের প্রচেষ্টাই প্রাক্সিসের সারকথা। কিন্তু অভিপ্রায় (intention) বা ইচ্ছার কোন উপাদান ছাড়া তা অসম্ভব। অভাববোধ বা অপূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন হতে হলে অভিপ্রায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবেই। অভিপ্রায়কে বাদ দিয়ে বর্তমান বাস্তব, অসংগত ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উত্তরণের যে মানবিক প্রচেষ্টা তাকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। সার্ত্র্-এর মতে, প্রাক্সিস্ সদাই দ্বান্দ্বিক, কারণ, পরিকল্পনা (Project) ও বাস্তব ঘটনার (fact) সংঘর্ষই দ্বান্দ্বিকতা। সার্ত্র্ তাঁর 'ক্রিটিক' গ্রন্থে একথাও বলেছেন যে, "দ্বান্দ্বিকতা এবং প্রাক্সিস্ এক ও অভিন্ন।" টমাস ফ্লিন্ মনে করেন যে, তরুণ এবং পরিণত সার্ত্র্-এর মধ্যে একটি পার্থক্য হলো এই যে, প্রথম দিকে সার্ত্র্ চেতনা বা স্ব-হেতু-সত্তাকে (Being-for-itself) প্রাধান্য দিয়েছেন, আর পরে প্রাক্সিস্-কে প্রাধান্য দিয়েছেন। সার্ত্র্ নিজেই বলেছেন, আমার তরুণ বয়সের রচনা মূলতঃ চেতনার বুদ্ধিবাদী দর্শন (Rationalist

Philosophy of consciousness)। কিন্তু যতোই সার্ত্‌র্‌-এর কেন্দ্র-বিন্দু চেতনা থেকে প্রাক্সিস্‌-এ সরে এসেছে, ততোই আমরা দেখতে পাই তাঁর দর্শনে জাগতিক পরিস্থিতির বা পরিবেশের (material environment) গুরুত্ব বাড়ছে। সার্ত্‌র্‌ কর্ম-কেই প্রাক্সিস্‌-এর মডেল হিসেবে নিয়েছেন। 'ক্রিটিক' গ্রন্থে সার্ত্‌র্‌ স্পষ্টতই বলেছেন, "মার্কস্‌বাদের অপরিহার্য আবিষ্কার হলো এই যে, শ্রম হলো সামাজিক সম্পর্ক সমূহের সংগঠনের যথার্থ ভিত্তি। এই আবিষ্কার প্রশ্নাতীত…।" প্রাক্সিস্‌ হলো জাগতিক পরিবেশে উদ্দেশ্যমূলক মানবিক কর্ম।

সার্ত্‌র্‌-এর 'ক্রিটিক' গ্রন্থটিতে দেখা যায় প্রাক্সিস্‌-এরই প্রাধান্য, আর এই প্রাধান্য তিন প্রকারের, যথা জ্ঞানবিদ্যক ও প্রণালী বিদ্যাগত প্রাধান্য, সত্তাবিজ্ঞানগত প্রাধান্য এবং নীতিবিজ্ঞানগত প্রাধান্য। প্রাক্সিস্‌-এর প্রাধান্যের নীতিই সার্ত্‌র্‌' ক্রিটিক' গ্রন্থটিতে প্রয়োগ করেছেন।

সার্ত্‌র্‌ দীর্ঘদিন ধরে নৃবিজ্ঞান অনুশীলন করেছেন এবং তাঁর সমস্ত উদাহরণ ঐতিহাসিক,—সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে এগুলি তিনি সংগ্রহ করেছেন। মার্কসীয় মতাদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী হলেও সার্ত্‌র্‌ মার্কসবাদে একটি 'শূন্যস্থান' আবিষ্কার করেছেন এবং প্রাক্সিসের সাহায্যেই ঐ শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা করেছেন। মার্কস্‌বাদকে পূর্ণায়িত করার জন্য অস্তিবাদকে তাই কাজে লাগিয়েছেন। মার্কস্‌বাদ, সার্ত্‌র্‌-এর মতে, নিঃসন্দেহে আজ-কের যুগের শ্রেষ্ঠ দর্শন ও সম্ভাব্য নৃবিজ্ঞান। কিন্তু বিভিন্ন মার্কস্‌বাদী রাষ্ট্রে মানুষের স্বাধীনতার চেহারা দেখে সার্ত্‌র্‌ সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাই তিনি মন্তব্য করেছেন যে, যতোদিন না মার্কস্‌বাদে ব্যক্তিস্বাধীনতার যথা-যোগ্য স্থান নির্দেশিত হবে, ততোদিন পর্যন্ত মার্কস্‌বাদ 'পূর্ণ' বলে বিবেচিত হবে না। মার্কস্‌বাদের শূন্যস্থান পূরণের জন্যই সার্ত্‌র তাই উদ্ভাবন করেছেন অস্তিবাদী মার্কস্‌বাদ। প্রাক্সিস্‌, সার্ত্‌র্‌-এর মতে, এমন একটি প্রত্যয় যা বিশ্বইতিহাসের দ্বান্দ্বিক গতির প্রমাণকে বহন করে এবং ঐ দ্বান্দ্বিকতার মানবিকীকরণকে সম্ভব করে তোলে। মানুষের আচরণ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়—এ কথা সার্ত্‌র্‌ তাই কখনও মানতে পারেন

নি। প্রাক্সিস্‌ সত্য বলেই সার্ত্‌র্‌ ব্যবহারবাদ বা আচরণবাদকে গ্রহণ করেন নি। প্রাক্সিসের সংগে আচরণবাদ সংগতিহীন।

সার্ত্‌র্‌-এর মতানুসারে দ্বান্দ্বিকতাকে মানবিক কর্ম বা প্রাক্সিসের বিচারের মাধ্যমে ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক যুক্তি হিসেবে দেখা যেতে পারে। মানবিক কর্মের বা প্রাক্সিসের বিচারের সম্যক অনুধাবন অভাব (বা প্রয়োজন) পরিকল্পনা, উত্তরণ (transcendence) প্রভৃতির প্রত্যয় বা ধারণা ছাড়া সম্ভব নয়। এগুলিই হলো প্রধান প্রধান ধারণা যেগুলিকে 'হাতিয়ার' বা 'যন্ত্র' (tools) হিসেবে ব্যবহার করে সার্ত্‌র্‌ মার্কস্‌বাদকে পূর্ণায়িত করতে চেষ্টা করেছেন।

দ্বান্দ্বিক যুক্তি এবং দ্বান্দ্বিক জড়বাদ (বস্তুবাদ) প্রসংগে সার্ত্র্

জাঁ-পল সার্ত্র্ ছিলেন পুরোপুরি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি —বামপন্থী মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ একজন বুদ্ধিজীবী। তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক-দার্শনিক জীবনাদর্শ অনুধাবন করতে হলে তাঁর 'ক্রিটিক' গ্রন্থটির মহান প্রচেষ্টাকে বুঝতে হবে। সার্ত্র্-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর সামাজিক-দার্শনিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী মার্কস্বাদের অনুকূলে, যদিও কেতাবী মার্কস্বাদীরা সার্ত্র্কে মার্কস্বাদী আখ্যায় আখ্যায়িত করতে রাজী নন। রাজনৈতিক উদারপন্থীরা মন্তব্য করেছেন যে, অস্তিবাদ হলো 'অ-যুক্তিবাদের আন্দোলন'। কখনও কখনও এমন মন্তব্যও করা হয়েছে যে, অস্তিবাদী আন্দোলন ব্যাপকভাবে সমর্থিত হলে ফ্যাসীবাদই হবে এর পরিণতি। এমন মন্তব্য যে সঠিক নয় তার প্রমাণ সার্ত্র্ নিজে। তিনি নিজেই ছিলেন ফ্যাসীবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় অংশীদার। কোন কোন সমালোচক বলেছেন যে, অস্তিবাদ হলো 'পাতি বুর্জোয়াদের শেষ বেপরোয়া আশ্রয়স্থল', যারা ইতিহাসের বিষয়গত অগ্রগতিতে আতংকিত। আবার কোন কোন সমালোচকের মতে, অস্তিবাদ হলো 'বিষয়ীগততার ভ্রাম্যমান আনন্দমেলা', একটি হৈ-হল্লা পর্ব বিশেষ। অস্তিবাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের মন্তব্যে সার্ত্র্ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, এবং তাঁর 'ক্রিটিক' গ্রন্থটিকে বস্তুত এই ধরনের মন্তব্যের প্রত্যুত্তর বলা চলে। তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠা

করতে গিয়ে সার্ত্র্ বলেছেন, "আমরা একই সংগে গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে, একমাত্র ঐতিহাসিক জড়বাদ বা বস্তুবাদই"[১] মানব ইতিহাসের ব্যাখ্যা দানে সমর্থ এবং অস্তিবাদ বাস্তবতত্ত্ব আলোচনার একমাত্র পথ …… ।"

আগেই বলেছি, 'বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস' গ্রন্থের তৃতীয় অংশের পাদটীকায় সার্ত্র্ ব্যক্তিবিশেষের সংগে অন্যান্যদের সম্পর্কের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেছেন যে, এই সব আলোচনা কখনও স্বাধীনতা ও মুক্তির একটি নীতিশাস্ত্রের সম্ভাবনাকে খণ্ডন করে না। কিন্তু তা লাভ করা যেতে পারে একমাত্র মৌলিক রূপান্তর সাধনের (Radical Conversion) পর……"। কিন্তু কী সেই 'মৌলিক রূপান্তর সাধন'? 'মৌলিক রূপান্তর সাধন' বলতে হুসার্ল-কির্য়েকগার্দ-হাইডেগারীয় পথ থেকে সরে এসে হেগেল-মার্কস্ীয় চিন্তা-ভাবনায় ভাবিত হওয়াকেই সার্ত্র্ বুঝিয়েছেন।

সার্ত্র্-এর সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তাধারা সম্যকরূপে বুঝতে গেলে তাই হেগেলীয় এবং মার্কসীয় দর্শনের প্রেক্ষাপটেই বুঝতে হবে। একথা তর্কাতীত যে, ফরাসী বুদ্ধিজীবীরা ১৮৩০ এবং ১৮৪০-এর দশকের জার্মান চিন্তাজগতের সম্রাট হেগেলের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেন নি। জার্মানী, ইংল্যান্ড এবং ইতালীতে যেমন হেগেলীয় সম্প্রদায় ছিল, ফ্রান্সে তেমন কোন সম্প্রদায় ছিল না। ফ্রান্সে হেগেলের স্বীকৃত কোন শিষ্যও ছিলেন না। ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নিষ্ঠাবান কোন হেগেল-চর্চাকারীরও খোঁজ মেলে নি। অবশ্য একমাত্র ব্যতিক্রম লুসিয়াঁ হের। তিনি ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের আগে পর্যন্ত ফ্রান্সের ইকোল নর্ম্যাল-এ হেগেল পড়াতেন বলে প্রমাণ রয়েছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন তরুণ মার্কস্বাদী-বুদ্ধিজীবী হেগেলকে অবশ্য খানিকটা স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ১৯২০-এর দশকে। বিশ শতকে হেগেলের 'ফেনোমেনোলজি অব্ স্পিরিট' গ্রন্থের ওপর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রচনা হলো জাঁ ওয়াল-এর।[২] গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে। জাঁ ওয়াল-এর উক্ত গ্রন্থটিও কিন্তু পুরোপুরি 'ফরাসী' নয়, এর একটি 'অ-ফরাসী' উৎস রয়েছে। ওয়াল ভালোই ইংরেজী জানতেন এবং তিনি ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত জসিয়া রয়েসের 'লেক্চার্স্ অন্ মডার্ন আইডিয়ালিজম্' গ্রন্থটি নিজ গ্রন্থ রচনার আগেই পড়া শেষ করেছিলেন। রয়েসের ঐ গ্রন্থে হেগেলের

---

১. সমাজজীবনের অনুশীলনে দ্বান্দ্বিক জড়বাদের (বস্তুবাদের) মূল নীতিগুলির প্রয়োগকে বলা হয় ঐতিহাসিক জড়বাদ (বস্তুবাদ)।

২. **Jean Wahl, The Unhappy Consciousness in the Philosophy of Hegel.**

'ফেনোমেনোলজি'-র জন্য ২৫ পৃষ্ঠা বরাদ্দ ছিল। বোধ করি সেজন্যই ওয়াল তাঁর গ্রন্থে বারবার হেগেলের রয়েসীয় ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন হতে পারে, হেগেলের প্রতি ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের কেন এই অনাগ্রহ? আলেকজান্দ্র্ কভেঙে-এর মতে, হেগেলের রচনার অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা, কার্তেজীয় ও কাণ্টীয় দার্শনিক ঐতিহ্যের শক্তিশালী প্রভাব, হেগেলের প্রটেস্টাণ্ট-ধর্মী মানসিকতা, ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত হেগেল-চর্চা না-হওয়া, সর্বোপরি হেগেলের যৌক্তিক সংশ্লেষণ ও ঐতিহাসিক ঘটমানতার অভিন্নতা সম্পর্কিত ধারণার প্রতি ফরাসীদের অবিশ্বাসই হেগেলের প্রতি অনাসক্তির মূল কারণ। ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের কাছে ইতিহাস যুক্তিবিজ্ঞান থেকে ভিন্ন। এই যদি ঘটনা হয়, তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, বা বলা যায় ১৯৪০-এর দশকে, হঠাৎ ফরাসী বুদ্ধিজীবীরা হেগেলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে গুরুত্ব দিতে শুরু করলেন কেন?

এই 'কেন'-র উত্তর দিতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন যে, ১৯৪০-এ ফ্রান্সের বিরাট পরাজয় লিবারেল-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব কমিয়ে দেয় এবং একটি ভাবগত শূন্যতার (conceptual vacuum) সৃষ্টি করে। মুক্তির ঠিক আগে ফ্রান্সে একমাত্র নৈতিক শক্তির উৎস ছিল প্রতিরোধ আন্দোলন, যা রাজনৈতিক প্রগতিশীল গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত ছিল। যুদ্ধ এবং প্রতিরোধ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ফ্রান্সের বৌদ্ধিক জীবনের রূপান্তর ঘটায়। ১৯৪৪-এর পর ফ্রান্সের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং বৌদ্ধিক জীবনের মৌল পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা জনমানসে পরিলক্ষিত হয়। সোস্যালিস্ট এবং কম্যুনিস্টদের মিলিত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে বুদ্ধিজীবীরা সামাজিক রূপান্তরের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে উল্লেখযোগ্য দার্শনিক ঘটনা (philosophical event) হলো হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির আবিষ্কার।

ক্যাথলিক, মার্কস্‌বাদী, অস্তিবাদী, মানসঘটনাবাদী (প্রদত্ত বিষয়বাদী), প্রভৃতি বিভিন্ন ঐতিহ্যানুসরণকারী বুদ্ধিজীবীরা এবং অ্যাকাডেমিক দার্শনিকগণ হেগেল-চর্চা ও আলোচনা নিয়ে মেতে উঠলেন। এই ধরনের চিন্তাধারা প্রচলিত ঐতিহ্যের কাছে 'নতুন' বলে চিহ্নিত হলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের কাছে হেগেলের প্রাধান্য ফরাসী চিন্তাধারায় এক নতুন যুগের সূচনা করল। এই ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, হেগেল-চর্চা ভাববাদী ও জড়বাদীদের মধ্যে বহুদিনের বিরোধ দূর করে চিন্তাভাবনা ও অনুসন্ধানের

ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেবে। ব্যাপক জনমানসে হেগেলকে, বিশেষ করে তাঁর 'ফেনোমেনোলজি' গ্রন্থটিকে, প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব বর্তায় দু'জন চিন্তাবিদের ওপর—একজন হলেন আলেকজান্দ্র্‌ কজেভ, এবং অপরজন জাঁ হাইপোলাইট। এই দু'জন দার্শনিক নিজে নিজেই হেগেল পড়েছেন দীর্ঘদিন ধরে, আলোচনা করেছেন, বক্তৃতা করেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত হেগেলের চিন্তাভাবনা নিয়ে, বিশেষ করে তাঁর 'ফেনোমেনোলজি' নিয়ে সুদীর্ঘ ভাষ্য রচনা করে জগৎ সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবার রসদ জুগিয়েছেন, জগৎকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার পথের সন্ধান দিয়েছেন। ফ্রান্সে কজেভ্‌ই প্রথম হেগেলের ওপর ভাষ্য রচনা করেন এবং প্যারিসে ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জনসমক্ষে তা বক্তৃতার মাধ্যমে প্রচার করেন। শুধু তাই নয়, তিনি শ্রোতাদের মধ্যে ঐ বক্তৃতাগুলি ছাপিয়ে বিতরণ করেছেন। সার্ত্‌র্‌ এবং মার্লো পঁতি কজেভের বক্তৃতা শুনেছেন; যে কটি বক্তৃতা শুনতে যেতে পারেননি তা পরবর্তী সময়ে মুদ্রিত আকারে সংগ্রহ করতে পেরেছেন অনায়াসেই। এ ছাড়া, হেগেল সম্পর্কে, বিশেষ করে তাঁর 'ফেনোমেনোলজি' সম্পর্কে, সার্ত্‌র্‌ ও মার্লো পঁতির মধ্যে আগ্রহ জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হেগেল শতবার্ষিকী সংখ্যাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঐ সংখ্যাটি ছিল খুবই আকর্ষণীয় কারণ তা ক্রোচে, হার্টম্যান, চার্ল্‌স্‌ অ্যান্ডলার, ভিক্টর বাস্ক্‌ প্রমুখ প্রথিত-যশা লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ ছিল।

১৯৩০-এর দশকে কজেভের প্রভাবে জাঁ হাইপোলাইট হেগেল এবং তাঁর 'ফেনোমেনোলজি' বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করতে শুরু করেন। তাঁর প্রবন্ধ ও ভাষ্যগুলি ছিল এক অর্থে অস্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত, যদিও সেগুলি মূলতঃ কজেভ্‌ ও ওয়ালের ভাবরসে সিঞ্চিত। কজেভের ধারণা ছিল যে, হেগেলের 'ফেনোমেনোলজি' একটি নতুন দার্শনিক নৃতত্ত্বের সূচনা করে। এ ভাবনা নিঃসন্দেহে অস্তিবাদী মার্কস্‌বাদ প্রতিষ্ঠায় প্রভাব বিস্তার করেছে। কজেভ্‌ মনে করতেন যে, 'মানুষ কে?', 'কী করে মানুষ 'সামাজিক' হলো?', 'সমাজের মধ্যে মানুষের অগ্রগতির (development) সম্ভাবনা কী রকম?' ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর হেগেল বৈপ্লবিকভাবেই দিয়েছেন। কজেভ্‌ হেগেলের চিন্তাভাবনার মধ্যেই দেখতে পেয়েছিলেন মার্কসীয় শ্রেণীসংগ্রামের ধারণার বীজ। কজেভের মতানুসারে, হেগেলের 'ফেনোমেনোলজি' বস্তুত একটি দার্শনিক নৃতত্ত্বকে কেন্দ্র করে রচিত। হাইপোলাইটও মনে করতেন যে, মানবীয় চেতনার ঐতিহাসিক আকার মেলে ধরার প্রচেষ্টাই পরিলক্ষিত

হয় হেগেলের 'ফেনোমেনোলজি'-তে এবং "তা বস্তুত একটি দার্শনিক নৃতত্ত্বকে সূচিত করে। ফরাসীদের কাছে কজেভ্ এবং হাইপোলাইট এই চিত্রই তুলে ধরেছিলেন যে, হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব আসলে মার্কসের দ্বন্দ্বতত্ত্বকে বোঝার ভূমিকা। ফরাসী বুদ্ধিজীবীরা তাই হেগেলকে মার্কস্‌বাদ চর্চার অপরিহার্য শর্ত এবং প্রেরণা হিসেবে গণ্য করেছেন। 'ফেনোমেনোলজি'-র ব্যাপক প্রভাবই ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের কাছে নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়ে মার্কস্‌বাদ ও অস্তিবাদের সম্পর্ক বিষয়ে অনুসন্ধান চালাতে তাঁদের প্রবৃত্ত করে।

যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সে কজেভ্ এবং হাইপোলাইট মার্কস্‌বাদ ও অস্তিবাদ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং এই আলোকেই তাঁরা হেগেলকে দেখেছেন। সার্ত্র্ এবং মার্লো পঁতির ওপর কজেভ এবং হাইপোলাইটের প্রভাব অপরিসীম। সার্ত্র্ এবং মার্লো পঁতিই হেগেল এবং তরুণ মার্কস্‌কে বিশ শতকের অস্তিবাদী ধারার সংগে যুক্ত করেন। শেষ পর্যন্ত, আমরা দেখতে পাই, সার্ত্র্ 'ক্রিটিক' গ্রন্থে অস্তিবাদ ও মার্কস্‌বাদের সমন্বয় ঘটিয়ে 'অস্তিবাদী মার্কস্‌বাদ' প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছেন।

সার্ত্র্-এর সংগে একদিকে যেমন হেগেল, অন্যদিকে তেমনি মার্কস্, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন। উভয়ের সংগে সার্ত্র্-এর সম্পর্ক নিবিড় হলেও তা কিন্তু অদ্ভুত এবং জটিল। সার্ত্র্-এর সংগে হেগেলের সম্পর্ক অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, সার্ত্র্-এর আগ্রহ, অন্ততঃ প্রাথমিকভাবে, আন্তর অভিজ্ঞতায়। পক্ষান্তরে, হেগেল ও তাঁর অনুগামীদের আগ্রহ বিষয়গত সত্যতায়। সার্ত্র্ প্রাধান্য দিয়েছেন আবেগ, ইচ্ছা এবং কর্মকে। পক্ষান্তরে, হেগেল প্রাধান্য দিয়ছেন বিশুদ্ধ যুক্তিকে। সার্ত্র্-এর কাছে ইতিহাস ব্যক্তিকৃত হয়েছে (history is individulised)। পক্ষান্তরে, হেগেলের কাছে ইতিহাস পরমীকৃত হয়েছে (history is absolutised)। হেগেল চেয়েছেন সারধর্মবাদকে (essentialism)। পক্ষান্তরে, সার্ত্র্ চেয়েছেন অস্তিবাদকে (existentialism)। হেগেল এবং সার্ত্র্-এর পার্থক্য খুবই প্রকট। তা সত্ত্বেও হেগেলের কাছে সার্ত্র্-এর ঋণের শেষ নেই। হার্বার্ট মার্ক্যুজ·মন্তব্য করেছেন যে, সার্ত্র্-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস্' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হেগেলের 'ফেনোমেনোলজি' গ্রন্থের পুনরাবৃত্তি। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের আলোচনা করতে গিয়েও সার্ত্র্ হেগেলকে অনুসরণ করেছেন। সার্ত্র্-এর 'বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস্' গ্রন্থের ওপর যে হেগেলের প্রভাব রয়েছে তার আর একটি প্রমাণ হলো সার্ত্র্-এর 'শূন্যতা' হিসেবে চেতনার ব্যাখ্যা। ঐ ব্যাখ্যায় হেগেলের প্রভাব সুস্পষ্ট।

হেগেলের দ্বন্দ্ব এবং চ্যুতি বা অনন্বয়ের ভাষা, বিশেষ করে যেভাবে তাঁর 'ফেনোমেনোলজি' গ্রন্থে পাওয়া যায়, সার্ত্র্-এর 'বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস্' গ্রন্থে তা আরো বিশদভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। হেগেল বিরোধের নিয়ম (Principle of opposites) ব্যবহার করেছেন দ্বান্দ্বিকতার জন্যই এবং সার্ত্র্ও দ্বান্দ্বিকতায় গভীর বিশ্বাসী। 'নঙর্থকরণ'-এর ধারণাও (concept of Negation) সার্ত্র্ হেগেলের কাছ থেকেই ধার করেছেন, যদিও তিনি তা ব্যবহার করেছেন হাইডেগারীয় অর্থে। সংক্ষেপে, সার্ত্র্-এর প্রধান প্রধান বিষয়গুলি প্রায় সবই হেগেলীয়। কিন্তু যেভাবে তিনি সেগুলি ব্যবহার করেছেন তা অ-হেগেলীয় (un-Hegelian), এবং অনেক-ক্ষেত্রে হেগেল-বিরোধী (anti-Hegelian)। কজেভ্, লুকাক্স এবং বিশেষ করে মার্ক্স্-এর চিন্তাভাবনার সংগে সম্যক পরিচয় থাকার জন্য সার্ত্র্ হেগেলকে গভীর-ভাবে এবং অস্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার প্রয়াস পেয়েছেন।

১৮৪৮-এর 'ম্যানিফেস্টো' থেকে শুরু করে মার্ক্সের প্রায় সমস্ত রচনা-সেগুলির প্রকাশকাল থেকেই সহজলভ্য ছিল এবং ১৮৮০-এর দশক থেকে ব্যাপকভাবে প্রভাবশীল ছিল। প্রায় সবগুলিরই ফরাসী অনুবাদ পাওয়া যেতো, যদিও সার্ত্র্-এর কাছে অনুবাদের প্রয়োজন ছিল না, কেননা, তিনি জার্মান ভাষাও ভালোই জানতেন। কম্যুনিজম্-এর প্রতি সার্ত্র্-এর সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব ছিল এবং বরাবরই তিনি ছিলেন কম্যুনিস্টপন্থী। প্যারিস যখন নাৎসীবাহিনীর পদানত তখন সার্ত্র্ মার্ক্সের ১৮৪৪-এর প্যারিস ম্যানুস্ক্রিপ্ট্স্ গভীর নিষ্ঠা ও যত্নসহকারে অধ্যয়ন করেন। যে সমস্ত কারণে সার্ত্র্ এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো "কম্যুনিজমের প্রতি সহানুভূতি, কজেভের মার্ক্স্বাদ বিষয়ক বক্তৃতা-মালায় যোগদান, সম্ভবতঃ বারডায়েভের কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনা পাঠ, তরুণ লুকাক্স্-এর লেখার দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া, এবং লুকাক্স্-এর রুমানিয়ান শিষ্য গোল্দ্মান-এর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও বন্ধুত্ব…।"[৩] সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা হিসেবে সার্ত্র্-এর 'মন্দ বিশ্বাস'-এর (Bad Faith) ধারণাটি তরুণ মার্ক্সের 'চ্যুতি' বা 'অনন্বয়'-এর ধারণার সমতুল্য। সার্ত্র্ মার্ক্সের সংগে একমত ছিলেন যে, দার্শনিকের কাছে সমস্যা হলো কী করে জগৎটাকে ব্যাখ্যা করা যায় তা নয়। মার্ক্সের মতো সার্ত্র্ও চিন্তা-সর্বস্ব দর্শন নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না, ছিলেন জগতের পরিবর্তন সাধনে

৩. Lee & Mandelbaum, Phenomenology & Existentialism.

উৎসাহী। মার্কস্ বলেছিলেন, 'মানস' মানুষের মনে প্রতিফলিত এবং বিভিন্ন মনন-প্রকরণে রূপান্তরিত জড়জগৎ ছাড়া কিছুই নয়। সার্ত্র্ মার্কসের ঐ বক্তব্য সমর্থন করেছেন।

হেগেলীয় ও মার্কসীয় দর্শনের কেন্দ্রীয় বিষয় হলো দ্বন্দ্বতত্ত্ব। সার্ত্র্ও তাঁর অস্তিবাদে অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগেই 'ডায়ালেক্টিক্স্' বা দ্বন্দ্বতত্ত্বের ধারণাটিকে বিশ্লেষণ করেছেন। ডায়ালেক্টিক্সের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, 'ডায়ালেক্টিক্স্' কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'ডায়ালিগো' থেকে যার অর্থ 'আলোচনা করা' বা 'তর্ক করা'। প্রতিপক্ষের তর্কধারার অন্তর্নিহিত স্ববিরোধগুলি প্রকাশ করে দিয়ে এবং সেগুলিকে অতিক্রম করে সত্যে পৌঁছানোর উপায়কে প্রাচীনকালে বলা হতো 'ডায়ালেক-টিক্স্' বা দ্বন্দ্বতত্ত্ব। প্রাচীন গ্রীক দর্শনে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখা গিয়েছিল, আর সেই দ্বান্দ্বিক ধারণার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন হিরাক্লিটাস্। তাই তাঁকে লৌকিক বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক চিন্তাধারার জনক-রূপে অভিহিত করা হয়। সব কিছুই বহমান, পরিবর্তনশীল ; অনড়, অচল, শাশ্বত, চিরন্তন বা সনাতন বলে কিছু নেই ; একই নদীতে আমরা দুবার স্নান করতে পারি না—হিরাক্লিটাসের এ ধরনের উক্তি প্রগতিশীল চিন্তাধারার পরিচায়ক বলে পরবর্তীকালে লেনিন কর্তৃক চিহ্নিত হয়েছে। বস্তুর বিপরীত-ধর্মিতার কথা, বস্তুর অগ্রগতির আন্তর উৎস হিসেবে বৈপরীত্যের সংগ্রামের কথা, বস্তু ও গতির একতার কথা আমরা হিরাক্লিটাসের দর্শনে পাই। সমস্ত কিছুই অপরিহার্যতা ও বিরোধের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়—হিরাক্লিটাসের এই মন্তব্য দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূল নীতিকে সূচিত করে। লেনিনের মতে, "হিরাক্লিটাসের বক্তব্য মোটামুটিভাবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের গোড়ার কথার সুন্দর বর্ণনা" (ফিলসফিক্যাল নোট বুকস্)। প্লেটো মনে করতেন যে, একমাত্র দার্শনিকরাই এই চিন্তাধারা বা পদ্ধতি অনুশীলন ও ব্যবহার করতে পারেন। তাঁর কাছে দ্বান্দ্বিক চিন্তাই হলো দার্শনিক চিন্তা। যাই হোক্, এবার আমরা ফিরে আসি হেগেল, মার্কস্ ও সার্ত্র্-এর দ্বন্দ্বতত্ত্ব সম্পর্কীয় ব্যাখ্যায়।

হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব : হেগেলের দর্শন 'সার্বিক দর্শন' নামে অভিহিত হয়। তিনি নিজেই এক সময় বলেছিলেন, তাঁর পূর্ববর্তী সকল দর্শনের সারভাগই তাঁর দর্শনের মধ্যে রক্ষিত আছে ; তাই তাঁর দর্শন 'সার্বিক দর্শন'। এই সার্বিক দর্শনের অন্যতম মৌলিক তত্ত্ব হলো দ্বন্দ্বতত্ত্ব। হেগেলের আগে অনেকেই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির কথা বলেছেন, কিন্তু কেউই এই পদ্ধতিকে

সর্বব্যাপী রূপ দিতে পারেন নি। সুতরাং দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সংগে হেগেলের নাম একান্তভাবে সংযোজিত হয়ে পড়েছে।

হেগেলের দর্শনে তাঁর অদ্বৈত পরম পদার্থ সর্বগ এবং তা বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্য। হেগেলের এই অদ্বৈত জীবন্ত ও বেগবান এবং তা নানারূপে বিশ্বের ভেতরে প্রকাশিত হয়। হেগেলের দর্শনের পরম পদার্থ কখনই নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। প্রকাশ ও ক্রিয়াই হলো পরম পদার্থের সারধর্ম বা আন্তরসত্তা। প্রকাশ ও ক্রিয়া চৈতন্যের ধর্ম। সুতরাং চৈতন্য হলো পরম পদার্থ অথবা পরম পদার্থ হলো পরম চৈতন্য। হেগেলের মতে, জগৎ মনুষ্য-বহির্ভূত কোন বিষয়গত চেতনার সৃষ্টি, যাকে 'পরমমানস' আখ্যা দেওয়া যায়।

হেগেলের দর্শনের একটি মুখ্যতত্ত্ব হলো গতিবাদ। হিরাক্লিটাস এবং বার্গসঁর মতে জগৎ গতিশীল। জগৎ সর্বদাই পরিবর্তিত হয়ে নব নব রূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু হেগেলের গতিবাদ পূর্বকথিত দার্শনিকদের গতিবাদ থেকে আলাদা। হিরাক্লিটাস ও বার্গসঁর মতে, গতি কেন্দ্রহীন ও অসীম। কিন্তু হেগেলের মতে, গতি অসীম হলেও কেন্দ্রহীন নয়। গতি পরাধী শক্তি (Absolute Reason) থেকে উদ্ভূত হয় এবং তাতেই প্রত্যাগত হয়। এই বিশ্ব একটি পূর্ণ আকার এবং পূর্ণতা ছাড়া কিছুই বাস্তব নয়। হেগেলের মতানুসারে, 'যা বাস্তব তাই যুক্তি-সংগত এবং যা যুক্তিসংগত তাই বাস্তব।' অযৌক্তিক কোন পদার্থের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। যা বাস্তব তা যুক্তিসংগত তখনই যখন এই বাস্তবকে পূর্ণতার দৃষ্টিভংগী নিয়ে দেখা যায়। বাস্তবতা ও যৌক্তিকতার অভিন্নতার ধারণা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, যার অস্তিত্ব আছে, তার থাকার একমাত্র কারণ অপরিহার্যতা বা ন্যায্যতা। যা অনায্য তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। সমস্ত জটিল অবস্থার সমষ্টি নিয়েই পূর্ণতা। এই পূর্ণতাকেই হেগেল বলেছেন 'পরম'। এই পরমেরই অস্তিত্ব আছে এবং এই পরম ভাবাত্মক (চেতনাত্মক) ও বাস্তব। ধারণাই তাই একমাত্র সত্য। কিন্তু ধারণাই যদি একমাত্র সত্য হয়, তাহলে পরম পদার্থের পক্ষে জড়ের অন্তর্নিহিত সত্তার মধ্যে ব্যক্তিকৃত হয়ে থাকার কারণটা কী? চিন্তা ও চিন্তার বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং 'অপর' (other) বা চিন্তাতিরিক্ত তত্ত্ব ব্যতিরেকে চিন্তার কোন সার্থকতা নেই। পরমমানসের বিষয়রূপে জড়াত্মক জগৎ সেই কারণেই অপরিহার্য। পরম পদার্থ বা পরম চৈতন্য যে জড়াকারে রূপ পরিগ্রহ করে তার কারণ ব্যাখ্যা করে হেগেল বলেছেন, দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুসারে অভিব্যক্তির মূল লক্ষ্য

হচ্ছে বিরোধকে সমন্বয়ের বন্ধনে রূপায়িত করা। এই বিরোধ ও সমন্বয় দুই পৃথক স্বতন্ত্র ধর্ম নয়। সমন্বয় বিরোধেরই সমন্বয়।

দ্বন্দ্বসমন্বয় হেগেলের দর্শনের একটি মুখ্য তত্ত্ব। তাঁর ভাববাদী দর্শনের দ্বন্দ্ববাদ বিশ্বগতির স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে। হেগেলের মতে, এই বিশ্বগতির রূপ দ্বান্দ্বিক এবং একে সরলরেখার দ্বারা অংকন করা যায় না। এর রূপ অথবা গতিভঙ্গী বৃত্তাকার। এই গতিবৃত্তের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে অদ্বৈত পরম পদার্থ। দ্বন্দ্বতত্ত্ব সম্পর্কে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, হেগেলের মতে, যুক্তিবৈজ্ঞানিক চিন্তার অভিব্যক্তি এবং জগতের অভিব্যক্তি বিরুদ্ধের সংঘাত (conflict of opposites) থেকে ঘটে থাকে। তাই হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব যেরূপ বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত চিন্তাধারার একটি বিশেষ গুণ, সেইরূপ জগতের অভিব্যক্তির ও এটি একটি বিশেষ গুণ। প্রজ্ঞার মধ্য দিয়ে যে ধারণা সমূহের অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে, আবার প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে জড়াত্মক বিষয়ের অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়, উভয়েতেই পরমপদার্থের অভিব্যক্তি সব সময় বিরোধ ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠছে। বিরোধের মধ্য দিয়ে সমন্বয় এবং সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্তি—একেই হেগেল দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া নামে অভিহিত করেছেন। দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুসারে, মানুষের প্রত্যেক ধারণাই একটি অন্তর্নিহিত গতির প্রভাবে এর বিপরীত ধারণায় পরিণত হয়, এবং এই উভয় ধারণা-ই পরে একটি উচ্চতর ধারণার মধ্যে সমন্বিত হয়। যেরূপ চিন্তাধারার অভিব্যক্তিতে দ্বন্দ্ব বর্তমান, সেরূপ জগতের অভিব্যক্তিতেও দ্বন্দ্ব বর্তমান। মানব-ইতিহাসের অভিব্যক্তিতেও আমরা এই বিপরীতের দ্বন্দ্ব দেখতে পাই। সুতরাং যে দ্বন্দ্বতত্ত্ব যুক্তিবৈজ্ঞানিক বা নৈয়ায়িক চিন্তায় কার্যকরী, তা প্রকৃতিতে এবং ইতিহাসেও কার্যকরী। এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির তিনটি স্তর আছে। যা বিরোধ-বিরহিত অবস্থায় আমাদের চিন্তার প্রথম বিষয়রূপে দেখা দেয়, হেগেল তাকে 'বাদ' (Thesis) বা 'প্রস্তাব' নামে অভিহিত করেছেন। 'বাদ'-এর বিরোধী চিন্তনীয় বিষয় হচ্ছে 'প্রতিবাদ' (anti-thesis), এবং এই বিরোধের মধ্যে যে চিন্তার সামঞ্জস্য বিধান করে তাকে 'সমন্বয়' (synthesis) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 'বাদ', 'প্রতিবাদ' এবং 'সমন্বয়'—এই তিন নিয়েই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ত্রয়ী। "বাদ একটি বচন স্বীকার করে, প্রতিবাদ তা অস্বীকার করে, যা হেগেলীয় ভাষায় বলা যায়, নঞীকরণ করে (negates) এবং সমন্বয় উভয়কেই আলিঙ্গন করে।"[৪] এখানে একটি কথা মনে রাখা

৪. **R. N. Carrew Hunt : The Theory & Practice of Communism.**

দরকার যে, সমন্বয় কিন্তু অভিব্যক্তির ছেদরেখা টেনে দেয় না, কেননা, আবার উচ্চতর বিরোধের মাধ্যমে উচ্চতর সমন্বয়ের প্রয়োজন অনুভূত হয়। হেগেলের দর্শনে বিরুদ্ধ-তত্ত্বের সংঘাতকেই দ্বন্দ্ব বলা হয় এবং যে পদ্ধতি এই দ্বন্দ্বের গতি ও রূপ অনুধাবন করে তাকেই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বলা যেতে পারে।

হেগেল তাঁর প্রকৃতি-দর্শনে কীভাবে পরম পদার্থের বহিরঙ্গীন প্রকাশ সম্ভব হলো তা-ই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, মন এবং জড় পরস্পরবিরোধী বলে প্রতিভাত হলেও উভয়েই পরমচৈতন্যের প্রকাশ। জড় চৈতন্য থেকে একান্ত বিজাতীয় হলে জ্ঞান সম্ভব হতো না। জ্ঞেয় বিষয় চৈতন্য থেকে বিজাতীয় নয় বলেই তার সম্পর্কে জ্ঞানালোচনা সম্ভব হয়। মানস-দর্শনে হেগেল ব্যক্তিমন ও সমাজমনের বিরোধিতার সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে পরমমানসের অভিব্যক্তির কথা বলেছেন। বিরোধ এবং সমন্বয় উভয়ই পরম চৈতন্যের প্রকাশ। পরম মানস এক। সুতরাং হেগেল অদ্বৈতবাদী। পরম মানস ভাবাত্মক। হেগেল তাই ভাববাদী। কিন্তু হেগেল অদ্বৈতবাদী হলেও তাঁর পরমপদার্থ বহুত্বকে অস্বীকার করে 'এক' নয়। তাঁর দর্শন অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, তাঁর মতে, জড় ও মনের মধ্যে, ব্যবহারিক ও পারমার্থিকের মধ্যে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে, সসীম ও অসীমের মধ্যে, তন্ত্রিত ও অতন্ত্রিতের মধ্যে, এক ও বহুর মধ্যে এক সক্রিয় ও দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক রয়েছে। এই দ্বন্দ্বতত্ত্বের বাদ, প্রতিবাদ ও সমন্বয়ের সমগ্র ছবি, হেগেলের মতে, পূর্ণতার মধ্যে অবস্থিত, আর পরমচৈতন্যই পূর্ণতার আসল রূপ। পূর্ণতার মধ্যেই সমস্ত বিরোধী শক্তির মিলন ও অবস্থান। এই পূর্ণতাই বাস্তব এবং এই চরম বাস্তবই ভাব। হেগেল সংঘাত বা দ্বন্দ্ব-প্রক্রিয়ার মধ্যে দেখেছিলেন পরমভাবের প্রকাশ। বাস্তব জগৎ আসলে পরম-ভাব বা পরম মানসের সৃষ্টি এবং বিশ্বের বিবর্তনের অর্থ পরম মানসের নির্দেশনের ক্রমপ্রকাশ।

ক্রমবিবর্তনের ধারা এগিয়ে চলেছে। হেগেলের মতানুসারে, প্রকৃতির মধ্যে এবং মানব সমাজের মধ্যে ক্রমবিবর্তনের ধারা এগিয়ে চলে আমাদের অজানিতে-ই। কিন্তু এই অজানা অবস্থা মানুষ চিন্তা করে অবহিত হতে পারে। বিশ্ব সম্বন্ধে ধারণা এইভাবেই সে তার চিন্তাশক্তির আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারে, এবং এইভাবেই হয় জ্ঞানেব বিকাশ। চিন্তার মধ্য দিয়েই বিশ্বের ক্রমবিকাশকে বুঝতে পারা যায়। মানুষ এবং প্রকৃতি এই সামগ্রিক চিন্তারই অঙ্গ। প্রকৃতি তার ক্রমবিকাশের ধারাকে জানতে পারে না, কিন্তু মানুষ তার উন্নতি সম্পর্কে সচেতন। বাহ্য জগতের ক্রমবিকাশের সংগে সংগে

মানুষের চিন্তাও উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। বিশ্বের ক্রমবিকাশ ও মানসিক চিন্তা একই। বিশ্বের সার্বিক ধারণাই সত্তা এবং আমাদের ব্যক্তিগত ধারণাই চিন্তা, এবং উভয়ের একই রূপ। সুতরাং সত্তা ও চিন্তা অভিন্ন। কোন বস্তু এবং তৎসম্বন্ধীয় চিন্তা অভিন্ন—এর অর্থ বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে কোন দূরতিক্রম্য বিভেদ নেই। কেননা, বিষয় বিষয়ীর মধ্যে বর্তমান।

হেগেলকে বুঝতে গেলে একথা মনে রাখতে হবে যে, তাঁর মতে এই জগৎ নৈয়ায়িক বা যুক্তিবৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে আবদ্ধ যুক্তিযুক্ত চিন্তা সমূহের সমাবেশ। তাঁর মতে, চিন্তা ব্যতীত, ধারণা বা ভাব ব্যতীত, অন্য কিছু জগতের মধ্যে নেই। আর এই ভাববিবর্তন ঘটে দ্বান্দ্বিক নিয়মানুসারেই। হেগেলের দ্বান্দ্বিক ভাববাদ অনুসারে, দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি হলো এক আত্মজ পদ্ধতি। তিনি এই পদ্ধতির সাহায্যেই **বিরুদ্ধের একত্ব** (unity of opposites) এই নৈয়ায়িক সূত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন।

হেগেলের দ্বান্দ্বিক ভাববাদ দর্শন জগতে যে একটা বৈপ্লবিক আলোড়ন এনেছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। মার্কসের ওপর হেগেলের প্রভাব অপরিসীম। এমন কি, মার্কস্ যখন হেগেলের বিপরীত কথা বলেছেন, তখনও তিনি সেই 'মহান চিন্তানায়ক'-এর (Mighty thinker) কথার পরিপ্রেক্ষিতেই তা বলেছেন। কিন্তু হেগেলের দর্শনের মধ্যে বৈপ্লবিক মনোবৃত্তির প্রকাশ থাকলেও তার ব্যবহারিক দিকটি ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। তাঁর দর্শনের এই দুই দিক তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বিভেদ রচনা করেছিল এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর তরুণ শিষ্যরাই তাঁর ভাববাদকে ধীরে ধীরে বস্তুবাদের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

মার্কসের দ্বন্দ্বতত্ত্ব ঃ তরুণ হেগেল-পন্থীদের মধ্যে মার্কস্ই হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্বের ভাববাদী খোলস পরিত্যাগ করে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সূত্রপাত ঘটান। যে বাস্তবের রূপটি প্রচলিত ছিল, সেই বাস্তবের এক প্রতিপক্ষ হিসেবে মার্কস্ উপস্থাপিত করলেন এমন এক দর্শন, যা, তাঁর মতে, গল্পের প্রমেথিউসের মতো সমস্ত পার্থিব এবং স্বর্গীয় দেবতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে ; সেই দর্শন মানুষকে এনে দেবে জ্ঞান ও স্বাধীনতার আলোক। মার্কসের মতে, দর্শন হলো 'কর্মের দর্শন'। তার কাজ শুধু মানুষের জানার ইচ্ছাকে তৃপ্ত করাই নয়, পৃথিবীকে যুক্তিসম্মতভাবে পুনর্গঠিত করা। তাঁর মতে, দর্শনকে মাটির পৃথিবী থেকে দূরে বিচরণ করলে চলবে না, সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হবে। দর্শনের কাজ হবে ইতিহাসের

অভিজ্ঞতাকে এবং সামাজিক মুক্তির জন্য উৎপীড়িত ও শোষিত জনগণের সংগ্রামকে অধ্যয়ন করা ও বোঝা ; দর্শনের কাজ হবে উপরিউক্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমাজের অগ্রগতির প্রকৃত নিয়মগুলিকে আবিষ্কার করা।

হার্বার্ট মার্ক্যুজ্‌ তাঁর 'রীজন অ্যান্ড রিভলিউশন' গ্রন্থে বলেছেন, 'হেগেলের পর দর্শনজগতে একটি প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দিল : মানুষের সারধর্মকে (Essence) কে পরিপূর্ণ করবে এবং দর্শনকে কে বাস্তব রূপ দেবে ? এর উত্তরে দুটি স্বতন্ত্র দর্শনের শাখার জন্ম হলো। একটি হলো ফয়ারবাখ্‌ ও কিয়েকের্গার্দের চিন্তাধারা, যা নিছক ব্যক্তিতার ওপর জোর দিল, আর একটা হলো মার্কসীয় চিন্তাধারা, যা সামাজিকতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করল···।" এই মার্কসীয় চিন্তাধারাই 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ' নামে দর্শনে চিহ্নিত। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বা জড়বাদ একটি বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা এবং একে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বলা হয়, কারণ, বস্তুজগতের প্রতি এর দৃষ্টি-ভংগী ও বস্তুজগতের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার পদ্ধতি হলো দ্বন্দ্ব-মূলক ; আর বস্তুজগতেব ঘটনাপ্রবাহের ব্যাখ্যা, সেই সম্পর্কে এর ধারণা এবং এর তত্ত্ব হলো বস্তুবাদী।

হেগেলের দ্বন্দ্ববাদকে ভাববাদের খোলসমুক্ত করে বস্তুবাদী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার 'পবিত্র কর্তব্য' মার্কস্‌ নিষ্ঠার সংগেই পালন করেছেন। হেগেল নৈয়ায়িক তত্ত্বের অভিব্যক্তি অনুশীলন করেই তার দ্বন্দ্ববাদ লিপিবদ্ধ করেছেন। ন্যায়ের তত্ত্বের ভেতরে দ্বন্দ্ব বর্তমান তা প্রমাণ করে তিনি একটি বিশ্বব্যাপী দার্শনিক তত্ত্বের সমর্থন করেছেন। হেগেল প্রথমেই ধরে নিয়েছেন যে, চিন্তাজগতে যা সত্য তা প্রকৃতিতে এবং ইতিহাসেও সত্য ; কারণ, তাঁর মতে, যা কিছু যুক্তিসংগত বা যৌক্তিক তাই বাস্তব। কিন্তু দ্বন্দ্ববাদরূপে একটি দার্শনিকতত্ত্ব ঘোষণা করতে হলে অভিজ্ঞতার যথাযথ বিশ্লেষণ করা আবশ্যক, এবং সেই বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই দ্বন্দ্বতত্ত্বের সমর্থন করা উচিত। কিন্তু হেগেল আত্মজপদ্ধতি তথা অভিজ্ঞতাপূর্ব পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করেন নি। যদি প্রকৃতিতে ও ইতিহাসে দ্বন্দ্ব বর্তমান থাকে তাহলে সেরূপ দ্বন্দ্বের জ্ঞান আমরা অভিজ্ঞতা থেকেই লাভ করি। ন্যায়ের তত্ত্ব অনুশীলন করে তা থেকে জগৎ-ব্যাপারের রূপ নির্ণয় করা অসম্ভব। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে শৃঙ্খলিত রূপ দেওয়াই ন্যায়শাস্ত্র বা যুক্তিবিজ্ঞানের কাজ। হেগেলের ভাববাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব ঘোড়াকে গাড়ীর সামনে না রেখে গাড়ীর পেছনে স্থাপন করেছে, অর্থাৎ, হেগেলের

দর্শন পায়ের ওপর ভর না করে মাথার ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। হেগেল যে ভাববিবর্তনের কথা বলেছিলেন এবং দ্বন্দ্বসমন্বয়ের ভিত্তিতে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, মার্কস্ ও এঙ্গেল্স্ তাকে বস্তুবাদী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে উল্টো থেকে সোজা করে দিয়েছিলেন। এঙ্গেল্স্ তাঁর 'অ্যান্টিডুারিং' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বলেছেন, "কেবলমাত্র মার্কস্ ও আমিই দ্বন্দ্বতত্ত্বকে জার্মান ভাববাদী দর্শনের কবলমুক্ত করে প্রকৃতি ও ইতিহাসের বাস্তব ধারণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছি।"

মার্কস্‌বাদের সমস্ত তত্ত্বই প্রকৃতপক্ষে বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ প্রসংগে স্মর্তব্য যে, মার্কসীয় বস্তুবাদ প্রাক্-মার্কসীয় যুগের যান্ত্রিক বস্তুবাদ বা জড়বাদ থেকে পৃথক। মার্কসীয় বস্তুবাদ যান্ত্রিক নয়, দ্বান্দ্বিক। মার্কস্ই দ্বন্দ্বতত্ত্বের সমৃদ্ধি ঘটিয়ে তাকে বৈজ্ঞানিক আকার দান করেছেন।

মার্কসীয় বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুযায়ী বস্তু হলো মন-নিরপেক্ষ, অর্থাৎ, বস্তুর অস্তিত্ব মনের ওপর নির্ভর করে না। জ্ঞান কখনও বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করে না। দ্বান্দ্বিক জড়বাদ বা বস্তুবাদ অনুযায়ী বস্তুই চরম বাস্তব এবং বস্তু সত্তার অস্তিত্ব আমাদের চেতনা-নিরপেক্ষ। বস্তুজগৎ পরস্পর সম্পর্কহীন এবং বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ-স্বতন্ত্র ঘটনাপুঞ্জের সমাবেশমাত্র নয়, বরং বস্তুজগৎ অখণ্ড ও সমগ্রভাবে সুসংহত এবং তার প্রতিটি বস্তু ও ঘটনাপুঞ্জের পারস্পরিক প্রকৃতিগত সংযোগ আছে। তারা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল ও পরস্পরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ 'অনুযায়ী বিশ্বপ্রকৃতি স্থানুধর্মী নয়, নিয়ত পরিবর্তনশীল ও গতিশীল। এঙ্গেল্স্ বলেছেন, "ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম বস্তু—একটি বালুকণা থেকে সূর্য অবধি, আদিম প্রাণকোষ থেকে মানুষ পর্যন্ত—সমগ্র প্রকৃতিই প্রতিনিয়ত আবির্ভূত ও তিরোহিত হচ্ছে, প্রতিমুহূর্তেই পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে—সকল বস্তুই নিরবচ্ছিন্ন গতি ও রূপান্তরের অবস্থায় রয়েছে।"[৫] কাজেই, এঙ্গেল্সের মতে, "দ্বন্দ্বতত্ত্ব প্রত্যেক বস্তু ও তার মানসিক প্রতিচ্ছবিকে মূলতঃ তাদের পরস্পর সম্পর্ক, সংলগ্নতা, গতিবেগ, অভ্যুদয় ও তিরোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে।"[৬]

মার্কসীয় দর্শনের অনেক আগেই দর্শনের ইতিহাসে দ্বন্দ্ববাদ ও বস্তু-

৫. F. Engels, Dialectics of Nature.

৬. F. Engels, Anti-Duhring.

বাদের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাক্‌-মার্কসীয় দর্শনে এই দুই তত্ত্ব বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল এবং দুয়ের মধ্যে কোন সংযোগ ছিল না। হেগেল দ্বন্দ্ব-বাদী ছিলেন কিন্তু বস্তুবাদী ছিলেন না; অপরপক্ষে, ফয়ারবাখ্‌ বস্তুবাদী ছিলেন কিন্তু দ্বন্দ্ববাদী ছিলেন না। মার্কস্‌ ও এঙ্গেলস্‌ই প্রথম দ্বন্দ্ববাদ ও বস্তুবাদের সমন্বয়ে দর্শনে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রবর্তন করেন। মার্কসীয় দর্শন মানুষের জীবনের সংগে ওতপ্রোতভাবে এবং ব্যবহারিকভাবে জড়িত। এই দর্শন 'কর্মের দর্শন', এখানে অলস চিন্তার কোন স্থান নেই। মানুষের সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে এই দর্শনের একটি বিরাট ভূমিকা আছে। মার্কস্‌ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সাহায্যে সমাজ ও ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন বিশ্লেষণ করেছেন। মানব সমাজ বর্তমানে যে অবস্থায় আছে সেখানে কীভাবে পৌঁছেছে, সমাজে পরিবর্তন কেন হয় এবং কীভাবে হয় তা অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, সেখানে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিই কাজ করে চলেছে। মার্কসের মতে, ইতিহাস কংকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা কিংবা ব্যক্তিমানুষের ইচ্ছার অভিব্যক্তি নয়, যদিও মানুষেব ইতিহাসকে সাধারণতঃ জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের কাহিনী বা দু' একজন রাজা কিংবা রাষ্ট্রনায়ক বা সেনাপতির কীর্তিকথা রূপে চিত্রিত করে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করা হয়।

মার্কসবাদে ইতিহাসের বস্তুগত ব্যাখ্যা, অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং দর্শন একটি অপরটির সংগে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত। একটিকে বুঝতে বা বোঝাতে অপর দুটির আলোচনারও অবতারণা করতে হয়। মার্কসের ইতিহাসতত্ত্ব হেগেলীয় তত্ত্বের বিরোধী। অগ্রগতির ভাববাদী ব্যাখ্যার মার্কস্‌ ছিলেন তীব্র বিরোধী; ভাববাদীরা মানুষের চেতনা বা ধারণার মধ্যেই খুঁজে পান সামাজিক অগ্রগতির মূল প্রেরণা। মার্কসের মতে. সামাজিক অগ্রগতি নির্ভর করে জাগতিক তথা বাস্তব কারণের ওপর, ব্যক্তির ইচ্ছা বা ধারণার ওপর নয়। ইতিহাসের মার্কসীয় ব্যাখ্যা বাস্তব ব্যাখ্যা, বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। মার্কসের মতে, জনসাধারণই হলো প্রকৃত ইতিহাস-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। মার্কস্‌বাদ ইতিহাস অধ্যয়নের দ্বারা সমগ্র মানব-ইতিহাসের পেছনে যেসব প্রাকৃতিক নিয়ম কাজ করে সেগুলিকে খুঁজে পেতে চায়। তাই তার অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু হলো জনসাধারণ, ব্যক্তিবিশেষ নয়। জনসাধারণের জীবনধারা অধ্যয়নে দেখা গেছে যে, সমাজের আদিম যুগের পর থেকেই মানুষ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সেই অংশগুলি পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তি নিয়ে কাজ করে। এক অংশের সংগে অপর অংশের এই বিরোধ দিখা দেয় ব্যক্তি হিসেবে নয়, শ্রেণী হিসেবে। মানবজাতির ইতিহাস মন্থন

করে মার্কস্ সমাজের শ্রেণীরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন এবং দেখিয়েছেন কীভাবে সমাজে একশ্রেণী অপর শ্রেণীর বাঁচবার দাবী অগ্রাহ্য করে। সেই দাবী আদায়ের জন্য শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম ও বিদ্রোহ করা ছাড়া উপায় থাকে না।

মার্কস্ই প্রথম ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, শৈল্পিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, এবং রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ একই সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এবং একই সূত্রে আবদ্ধ। ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা থেকেই আমরা জানতে পারি কোন বিশেষ সমাজব্যবস্থার উত্থান ও পতন বা নতুন কোন সমাজব্যবস্থার প্রচলন। মানুষ কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, মানব সমাজের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, উৎপাদন, উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন, এবং বিনিময়ের রীতিনীতি ইত্যাদি নিয়েই সামাজিক ইতিহাসের সূচনা,—এই রীতিনীতিই ইতিহাসের পথ নির্দেশ করে। কতকগুলি যুদ্ধবিগ্রহ, কিংবা বড় বড় রাজনীতিবিদদের সিদ্ধান্ত ইতিহাসের গতি নির্ণয় করে না, ধারাও পাল্টে দেয় না। মহৎ ব্যক্তিদের জীবনীর সমাহারেও ইতিহাসের কাঠামো রচিত হয় না।

মার্কসের মতে, মানবসমাজের প্রাথমিক চাহিদা হলো জীবিকার সন্ধান করা। প্রতিটি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদনী সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে। সামাজিক মানুষ উৎপাদন কার্যের জন্য পরস্পরের সংগে নির্দিষ্ট সম্পর্কে সম্পর্কিত হয় এবং এই সম্পর্কের চরিত্র নির্ভর করে উৎপাদন পদ্ধতির ওপর। মার্কসের মতে, উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উৎপাদন-ভিত্তিক সম্পর্ক সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির মূলে ; আর এই অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপরই গড়ে ওঠে আমাদের সকল সামাজিক, নৈতিক ও দার্শনিক অন্যান্য ধারণা। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে সংঘর্ষ চলেছে—একদিকে উৎপাদন শক্তি এবং অন্যদিকে উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে, একদিকে উৎপাদনের উপাদান বা যন্ত্রসমূহ ও তাদের ব্যবহাররীতি, অন্য দিকে তাদের মালিকানা সম্পর্কের মধ্যে। উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক —এই দুটি হচ্ছে মার্কসের ইতিহাসতত্ত্বের মূলকথা। এদের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে শ্রেণীসংগ্রাম শুরু হয়। শ্রেণীসংগ্রামের প্রবক্তা মার্কসের মতে, এ পর্যন্ত মানুষের যা কিছু ইতিহাস তা হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। এই সংগ্রামই মানুষের সমগ্র-ইতিহাসকে চিহ্নিত করেছে।

মার্কস ইতিহাসের সমস্ত বিকাশকে উৎপাদন পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল বলে মেনেছেন, যার মধ্যে দুটি দ্বন্দ্বশীল উপাদান রয়েছে—উৎপাদনশক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্ক। হেগেল ইতিহাসের গতিশক্তিকে দেখেছেন মানুষের

ভাবচেতনার মধ্যে, আর মার্কস্‌ দেখেছেন উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে। সমস্ত যুগে-ই সমাজের অভ্যন্তরে অসাম্য ক্রিয়াশীল এবং তার প্রকাশ ঘটে দ্বন্দ্বশীল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে। মার্কস্‌ীয় ইতিহাস-দৃষ্টি অনুসারে যুধ্যমান শ্রেণী-গুলির দ্বন্দ্বই সমাজ-বিবর্তনে প্রধান চালিকাশক্তি।

মার্কসের মতে, মানুষের জীবন প্রধানতঃ অর্থনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তার অর্থনৈতিক সত্তা থেকেই 'আইডিয়া' বা ধারণার উদ্ভব। 'রিয়ালিটি' বা বাস্তবতত্ত্ব বলতে তিনি মুখ্যতঃ অর্থনৈতিক পারম্পর্যই বোঝাতে চেয়েছেন। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় মার্কস্‌ বিশ্বাসী ছিলেন সত্য, কিন্তু ইতি-হাসের এরূপ ব্যাখ্যার অর্থ এই নয় যে, তাতে ধারণার কোন স্থান নেই, ধারণাও সেখানে প্রাকৃতিক ক্রিয়ার অন্তর্গত। মানুষের দেহ-মনে, তার ইচ্ছা ও শক্তিতে এই ধারণা কার্যকরী হয়ে তাকেও ইতিহাসের ক্রিয়ার অংশে পরিণত ক'রে। মানুষের মস্তিষ্কে ধারণা রূপ লাভ করে এবং মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে ইতিহাস সৃষ্টি সম্ভব করে তোলে। মার্কসের মতে, চিন্তাসর্বস্ব দর্শন যথেষ্ট নয়; ইতিহাসের মাধ্যমে তাকে কর্মে রূপ লাভ করতে হবে। মার্কস্‌বাদের এই সিদ্ধান্ত-ই মানুষকে সজ্ঞানে ইতিহাস সৃষ্টির প্রেরণা দিলো। সেই প্রেরণাই মার্কস্‌বাদে, মানুষের জীবনরক্ষার প্রয়োজনে, অর্থনৈতিক ক্রিয়ার ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলো। আদিকাল থেকেই মানুষ বাঁচবার জন্য সংগ্রাম করে আসছে। সেই সংগ্রামই যে মনুষ্যসত্তার মূল প্রেরণা জীববিজ্ঞানে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মার্কস্‌ বলেছেন, জীবিকা অর্জনের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে মানুষের জীবন অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণাধীন হয়েছে; বস্তুবাদী দ্বন্দ্বসমন্বয়ের মধ্য দিয়ে মানুষের সৃজনী প্রতিভার কার্যকারিতা প্রকাশ পেয়েছে; মানুষ বুঝেছে যে, নিজের ভাগ্য-গঠনে তার সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বকে বিপ্লবে সার্থক করার ভূমিকা মানুষের সৃজনী-প্রতিভার ওপরই মার্কস্‌ ন্যস্ত করেছেন।

মার্কসের মতানুসারে, মানব-বিকাশের ইতিহাস এবং সেই সংগে মানব-সমাজের বিকাশের ইতিহাসও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। মানুষের বিকাশ ও সেই সংগে সমাজ ও তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশের ইতিহাসের ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রয়োগকেই বলা হয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ' এবং 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' শব্দ দুটির প্রথম প্রয়োগকর্তা যথাক্রমে প্লেখানভ্‌ এবং এঙ্গেলস্‌, মার্কস্‌ নন।"[১]

১. **Karl Marx : Selected Writings in Sociology and Social Philosophy, Bottomore & Rubel.**

সমাজের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ওপর সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার ও ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটে। সুতরাং একথা অনায়াসেই বলা যেতে পারে যে, সমাজ ও তার প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাস আলোচনা করার অর্থই হলো সমাজে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থার ইতিহাস আলোচনা করা। প্রকৃতির বস্তু ও শক্তির ওপর মানুষের শ্রম প্রয়োগ করে দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করার প্রক্রিয়ার নামই হলো উৎপাদন। উৎপাদনের মূল উপাদান তাই দুটি, প্রকৃতি ও শ্রমশক্তি। শ্রমই হলো মানুষের অস্তিত্বের অপরিহার্য শর্ত। প্রকৃতির সংগে মানুষের সংযোগ সাধিত হয় শ্রমের মাধ্যমেই। উৎপাদন ব্যবস্থায় মানুষ দুটি বিশেষ সংযোগ রক্ষা করে কাজ করে—প্রথমটি হলো 'প্রকৃতির সংগে মানুষের সংযোগ', আর দ্বিতীয়টি হলো 'মানুষের সংগে মানুষের সংযোগ'। মার্কস্ বলেছেন, "উৎপাদন ব্যাপারে মানুষ শুধু প্রকৃতির ওপর ক্রিয়া করেনা, পরস্পরের ওপরও ক্রিয়া করে। এক বিশেষ প্রকারের সহযোগিতা ও পরস্পর আদান-প্রদানের মধ্য দিয়েই উৎপাদন সম্ভব হয়। উৎপাদন করতে হলে মানুষকে পরস্পরের সংগে কয়েকটি বিশিষ্ট সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়। এই সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেই প্রকৃতি-জগতের ওপর প্রভাব বিস্তার করা অর্থাৎ উৎপাদন করা সম্ভব।"[৮] উৎপাদন বলতে সামাজিক উৎপাদনই বোঝায়, কেননা, মানুষ সমাজবদ্ধভাবে একে অন্যের ওপর নির্ভর করে পরস্পরের সহযোগিতায় উৎপাদনের কাজ করে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষে মানুষে এই পারস্পরিক সংযোগকেই বলা হয় উৎপাদন সম্পর্ক। উৎপাদন সম্পর্ক স্থির হয় উৎপাদনের উপাদানের মালিকানার ভিত্তিতে। সমাজের এক ক্ষুদ্র অংশ উৎপাদনের মালিক হয়, আর অপর বৃহৎ অংশ প্রাণান্ত শ্রম করে। সমাজের বৃহৎ অংশ এভাবেই শোষিত হয় ক্ষুদ্র অংশের দ্বারা। এরূপ অসাম্য ও শ্রেণীভেদ মার্কসের কাছে ছিল অসহ্য। উৎপাদন ব্যবস্থার অংশ দুটির মধ্যে, অর্থাৎ উৎপাদন-শক্তির ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে, দ্বন্দ্বই কোন উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য দায়ী, আর মার্কসের মতে, এটাই হলো সমাজবিকাশের মূলতত্ত্ব।

সমস্ত দর্শনের, বিশেষতঃ সাম্প্রতিকতম দর্শনের, বৃহৎ বনিয়াদি প্রশ্ন হলো চিন্তা ও সত্তার সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রশ্ন। চিন্তার সংগে সত্তার সম্পর্ক কী, চৈতন্য ও প্রকৃতির মধ্যে কোন্টি আদি—এ প্রশ্নের উত্তরকে কেন্দ্র

৮. **Karl Marx ; Selected works.**

করে চিন্তাবিদ্‌রা দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছেন। যাঁরা বস্তুর চেয়ে চৈতন্যকে প্রাধান্য দেন তাঁরা ভাববাদী, আর চৈতন্যের তুলনায় বস্তুকে যাঁরা আদি মনে করেন তাঁরা বস্তুবাদী। হেগেল ভাববাদী, আর মার্কস্‌ বস্তুবাদী। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অন্যতম বিষয়ই হলো বস্তু ও চেতনার সম্পর্ক কী তা ঠিক করা। এ মতবাদ অনুসারে, বস্তু সত্তা হলো একটি বিষয়মুখী বাস্তবসত্তা যার অস্তিত্ব আমাদের চেতনার বাইরে নিরপেক্ষ-ভাবে বিরাজমান। বস্তুই হলো সংবেদন, ভাবনা এবং চেতনার উৎস। চিন্তা বস্তু থেকে উদ্ভূত। বস্তু যখন বিকাশ লাভ করে তখন চিন্তার উদ্ভব ঘটে। মার্কসীয় দর্শনে বস্তুই মুখ্য, চেতনা হলো গৌণ, কারণ, চেতনা বস্তুর একটি প্রতিফলন, মস্তিষ্কের প্রতিচ্ছবি। মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শন ব্যাখ্যা প্রসংগে লেনিন তাঁর "মেটেরিয়ালিজম্‌ অ্যান্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম্‌" গ্রন্থে বলেছেন, "সাধারণভাবে বস্তুবাদ বিশ্বাস করে যে, বাস্তব জগতে প্রকৃত সত্তার (বস্তুর) স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে; তার অস্তিত্ব চৈতন্য, অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে না।·· চৈতন্য হলো বস্তুসত্তারই প্রতিচ্ছবি। যা আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহের ওপর সক্রিয় হয়ে অনুভূতির সঞ্চার করে তাই বস্তু—বস্তুই প্রকৃত সত্য। বস্তু, প্রকৃতি, জৈবিক অস্তিত্ব ও পদার্থ হলো মুখ্য, আর আত্মা, চৈতন্য, অনুভূতি—এ সব কিছুই গৌণ···।" সংক্ষেপে বলা যায়, বস্তু চেতনা থেকে উৎপন্ন নয়, বরং চেতনাই বস্তুর ক্রিয়া-ফল। মার্কস্‌ নিজেই বলেছেন, "মানুষের চৈতন্য তার অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে না, মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তার চৈতন্যকে নিয়ন্ত্রণ করে।"[১]

হেগেলের কাছ থেকে মার্কস্‌ শিখেছিলেন যে, মানুষ নিজেকে ও নিজের জগৎকে সৃষ্টি করে,—সৃষ্টি করে ব্যবহারিক কর্মের মাধ্যমে। এই কর্মের প্রভাবে মনুষ্য-প্রকৃতির পরিবর্তন হয়, একই সংগে বহিঃপ্রকৃতিরও রূপান্তর ঘটে। মার্কস্‌ বলেছেন যে, হেগেল সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ইতিহাসের ধারাকে। ঐ ধারাপথে মানুষ নিজেকে সৃষ্টি করে আর এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সঞ্চালক শক্তি হলো মনুষ্য-শ্রম। ফয়াববাখের কাছ থেকে মার্কস্‌ শিখেছিলেন যে, নৃতত্ত্ব ইতিহাসের চাবিকাঠি। একথা স্বীকৃত যে, একদিকে হেগেলীয় ইতিহাসের দর্শনের ধারা ও অন্যদিকে ফয়ারবাখের বস্তুবাদী নৃতাত্ত্বিক দর্শনের ধারা মার্কসের চিন্তার প্রবাহে সংগম সৃষ্টি করেছে। মার্কস্‌ হেগেল ও ফয়ারবাখের কাছে তাঁর ঋণের কথা উল্লেখ করেও উভয়ের দর্শনের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণে উদ্যোগী হয়েছেন।

১. Karl Marx, Selected works.

সামাজিক-অর্থনৈতিক বিরোধ হেগেলের কাছে আসলে চিন্তন-সত্তা ছাড়া কিছুই নয়। অন্যভাবে বলা যায়, হেগেলের মতে, দ্বন্দ্ব বা বিরোধ ধারণা-সমূহের মধ্যে রয়েছে। তিনি বিভিন্ন বিরোধের মধ্যে ঐক্য খুঁজে পান পরম-ব্রহ্মের ধারণায়। তাঁর দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের আকার রক্তমাংসহীন বিমূর্ত চিন্তা। কিন্তু মার্কসের মতানুসারে, দ্বন্দ্বতাত্ত্বিক দর্শনের কাছে অপরিবর্তনীয়, চূড়ান্ত বা 'পরম' বলে কিছু নেই। মার্কস্ বলেছেন, হেগেল শ্রমকে আধ্যাত্মিক শ্রম হিসাবে দেখেছেন। কিন্তু তা যথার্থ ও বাস্তব নয়। মার্কস্ হেগেলের ব্যাখ্যার সমালোচনা করলেও তাঁর পদ্ধতি-প্রণালী (Methodology)-কে গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া, মার্কস্ বিশ্বাস করতেন যে, হেগেলকে নিছক অবজ্ঞাভরে পাশে ঠেলে দেওয়া সংগত নয়। ফয়ারবাখ্ বিনা বাক্যব্যয়ে হেগেলকে পাশে সরিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু ইতোমধ্যে ১৮৪৮-এর বিপ্লব অনায়াসে প্রায় সমস্ত দর্শনকেই ঠেলে সরিয়ে দেয় এবং সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে ফয়ারবাখ্ নিজেও আড়ালে পড়ে যান। মার্কস্ সেজন্যই হেগেলকে অবজ্ঞা না করে হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি নিয়েই আলোচনা শুরু করেছেন এবং সমালোচনার মাধ্যমে এটা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন যে, হেগেলীয় রূপে দ্বন্দ্বতত্ত্ব অকেজো। তাই হেগেলের দ্বন্দ্ব যেভাবে মাথার ওপর দাঁড়িয়েছিল, মার্কস্ তাকে ঘুরিয়ে পায়ের ওপর দাঁড় করালেন। হেগেল দ্বন্দ্ব বা বিরোধ দেখেছিলেন ধারণা সমূহের মধ্যে, কিন্তু মার্কস্ দেখেছেন বস্তু এবং প্রকৃতির মধ্যেই। বস্তুত জগতের মধ্যেই রয়েছে দ্বন্দ্ব বা বিরোধ, আর বিরোধ থেকেই জন্ম নেয় ধারণাসমূহ ; ধারণাসমূহ বিরোধের জনক নয়। লেনিনের মতানুসারে, "প্রকৃত প্রস্তাবে বস্তু প্রকৃতির মর্মমূলে অন্তর্নিহিত বিরোধের আলোচনাই দ্বন্দ্বতত্ত্ব।"[১০]

ফয়ারবাখ্ নিত্য সনাতন মনুষ্য স্বরূপের তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেছিলেন। কিন্তু মার্কসের মতে, মানুষকে ঐতিহাসিকভাবে দেখতে হবে। বোধকরি সেজন্যই মার্কস্ হেগেলীয় দর্শনকে যেমন মর্ত্যের মাটিতে প্রোথিত করেছেন তেমনি ফয়ারবাখের দর্শনকে বেঁধেছেন ইতিহাসের বাঁধনে। এই দ্বৈত কাজের ফসলই হলো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুসারে এ বিশ্ব গতিশীল এবং বিশ্বকে তৈরি জিনিসের যৌগিক সমাহার না ভেবে 'প্রক্রিয়ার' যৌগিক সমাহার বলে বিবেচনা করা উচিৎ। এই বিশ্বপ্রক্রিয়া গতির নিয়ম তথা বিকাশের নিয়মে চলেছে।

V. I. Lenin, Philosophical Notebooks.

বস্তুসত্তার অন্তর্নিহিত বিরোধের নিয়মই বিকাশের নিয়ম। বস্তু ছাড়া বিশ্ব নেই, আবার দেশ-কাল ছাড়া বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা নেই। বস্তুময়তার ঐক্যেই বিশ্ব। মানুষের চেতনা ও সমাজ তাই বিশ্ববিযুক্ত বা বিশ্ববহির্ভূত নয়। যে দেশ-কাল বস্তুর ওপর ভিত্তি করে মানুষ যুগে যুগে বস্তুজগতে তার জ্ঞানের ইমারত গড়েছে, আজও গড়ে তুলছে—সেই ভিত্তি গতিহীন নয়, বরং গতিশীল রূপেই প্রতিফলিত। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের কাছে তাই 'পরম' বা 'চূড়ান্ত' বলে কিছু নেই। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ গড়ে উঠেছে মানুষের যুগ যুগ সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডার ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ শুধু একটি বিশ্বদর্শন নয়, একটি জীবন দর্শন, একটি বাস্তব কর্ম-নির্দেশ।

সার্ত্র্‌-এর দ্বন্দ্বতত্ত্ব ঃ মার্কসের মতো সার্ত্র্‌ও চিন্তাসর্বস্ব দর্শন নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। দর্শনের সাহায্যে জগতের শুধু ব্যাখ্যা করেই সার্ত্র্‌ সন্তুষ্ট হন নি, জগতের মানবীয় পরিবর্তনের তিনি ছিলেন দিশারী। মার্কসের মতো সার্ত্র্‌-এরও চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নিপীড়ন ও শোষণের সামাজিক দিক। মার্কসের মতো সার্ত্র্‌ও বিশ্বাস করতেন যে, এই জগতের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে মানুষ, জগতের যতো ওঠাপড়া, ভাঙ্গাগড়া সবই মানুষের দ্বারা হয়েছে। মানুষ নিজেই তার ভাগ্য নিয়ন্তা, নিজেই নিজের নিয়ামক,, নিজের ভাগ্যগঠনে তার সক্রিয় ভূমিকা আছে। সেখানে তাকে সাহায্য করার জন্য কোন ঈশ্বর নেই।

সার্ত্র্‌ বিশ্বাস করতেন যে, মার্কস্‌ জগতে দ্বন্দ্বতত্ত্বের আবিষ্কার করেছেন জাগতিকভাবে বা অভিজ্ঞতাভিত্তিক রূপে এবং তাঁর 'ক্রিটিক' গ্রন্থে তিনি মার্কসের ইতিহাস রচনার যাথার্থ সমর্থন করতে চেয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, জগৎ সম্পর্কিত সমস্ত চিন্তাভাবনার মূলে রয়েছে এক ধরনের অনিবার্যতা (Necessity), আর ঐ সমস্ত চিন্তাভাবনাকে দ্বান্দ্বিক বলে প্রমাণ করা যায়। সার্ত্র্‌-এর মতে জগতে মানুষের ক্রিয়া, বস্তুতান্ত্রিক জগতে মানুষের যৌক্তিক অভিপ্রায় (Rational intention), যাকে মার্কসীয় নাম 'প্রাক্সিস্‌' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, নিজেই দ্বান্দ্বিক। সংঘাত এবং বিরোধের অতিক্রমণ—এই দুয়ের মাধ্যমেই তার অগ্রগতি ঘটে। সার্ত্র্‌ ঘোষণা করেছেন যে, মানুষের ক্রিয়ার দ্বান্দ্বিক রূপ সম্পর্কে অবহিত না হয়ে দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক গবেষণা বা অনুসন্ধান সহ যে কোন প্রকার যৌক্তিক ক্রিয়ায় রত হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

সার্ত্র্‌ তাঁর 'ক্রিটিক' গ্রন্থে মার্কস্‌বাদকে বিশ শতকের 'শ্রেষ্ঠ দর্শন' বলে চিহ্নিত করেছেন ; শুধু তাই নয়, একে 'অপরিহার্য' বলে অভিহিতও-

করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো সার্ত্র্ কী করে এই দাবী করতে পারেন? একথা বলা হয়েছে যে, দ্বন্দ্বতত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে (in ignorance of the dialectic) সার্ত্র্ মার্কসের 'ডাস্ ক্যাপিটাল' গ্রন্থটি পাঠ করেছিলেন। শুধুমাত্র পুঁথিগতভাবে (academically) তিনি তা বুঝেছিলেন, কিন্তু ঐ গ্রন্থপাঠ তাঁর মধ্যে কোন পরিবর্তন আনে নি। সার্ত্র্ এবং সমকালীন অনেকেই ভুল করে একথা ভেবেছিলেন যে, যে কোন দর্শন বা সমাজবিজ্ঞান পড়ার মতো মার্কস্-কেও পড়া সম্ভব। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছিল, আর এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী চারিদিকে তাঁরা যা দেখেছিলেন,—তাঁরা যা পড়েছিলেন, তা নয়। "এটা ছিল মার্কস্‌বাদের বাস্তবতা, আমার চারপাশে বিশাল শ্রমিক শ্রেণীর উপস্থিতি, যারা মার্কস্‌বাদকে জীবন দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছে, যারা মার্কস্‌বাদের অনুশীলন করে, এবং যারা দূরে থেকে পাতি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের অপ্রতিহতভাবে আকর্ষণ করে।"[১১] তারপর সবশেষে এলো বিশ্বযুদ্ধ, প্যারিস নাৎসীবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হলো, এবং প্রতিরোধ বাহিনীও তৈরী হলো। এই সমস্তই পুরোনো চিন্তাধারার কাঠামোয় পরিবর্তন নিয়ে এলো। সার্ত্র্ ঘোষণা করেছেন, "আমরা শ্রমিক শ্রেণীর পাশে থেকে যুদ্ধ করেছি এবং চূড়ান্তভাবে উপলব্ধি করেছি যে, ইতিহাস ও তার দ্বান্দিক সঞ্চরণশীলতা হলো অমোঘ মূর্ত ঘটনা।"[১২]

সার্ত্র্ বলেছেন যে, আজকের দিনে মার্কস্‌বাদ হলো সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ নৃবিজ্ঞান। এটাই একমাত্র মতবাদ যা মানুষকে সমগ্র (totality) হিসাবে বিচার করে এবং তার অবস্থার জাগতিক দিককে (materiality of his condition) প্রস্থানবিন্দু হিসেবে গণ্য করে। কিন্তু মার্কস্‌বাদী চিন্তাধারা বিকাশের ক্ষেত্রে তিনি একটি ত্রুটি আবিষ্কার করেছেন। সার্ত্র্-এর মতে, মার্কস্‌বাদীরা প্রশ্নকর্তাকেই (questioner) সরিয়ে দিয়েছেন। সার্ত্র্ তাঁর স্বাধীন ব্যক্তিমানুষের ধারণার সাহায্যে মার্কস্‌বাদের ঐ ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করেছেন। সার্ত্র্-এর মতে, স্বাধীন ব্যক্তিমানুষকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ না করলে মার্কস্‌বাদ হয়ে পড়বে অ-মানবিক নৃবিজ্ঞান (inhuman anthropology)।

সার্ত্র্-এর কাছে দ্বন্দ্বতত্ত্বের মর্যাদা (status of the dialectic) একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক সমস্যা, কেননা, দ্বন্দ্বতত্ত্ব হলো মার্কসের

১১. **Sartre, Search for a Method.**
১২. ঐ

ইতিহাসের ব্যাখ্যার প্রাণস্বরূপ। সার্ত্র্ মনে করেন যে, দ্বন্দ্বতত্ত্ব একই সংগে চিন্তার পদ্ধতি এবং বাস্তবতত্ত্বের কাঠামো বা গঠন (method of thought and structure of reality)। যুক্তিবিচার এবং জ্ঞানের বিষয় উভয়ই গতিশীল (in motion), একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। যদিও দ্বন্দ্বতত্ত্বকে জগতে খুঁজে পাওয়া যায়, তবু দ্বন্দ্বতত্ত্ব মানুষের অভিজ্ঞতা-সমূহের সমগ্রীকরণের মাধ্যমেই (Through totalizing) গঠিত হয়। সার্ত্র্-এর মতে দ্বন্দ্বতত্ত্বের ছেদ টানা যায় না, চূড়ান্ত সমগ্রতার (final totality) মধ্যে তা কখনও বন্ধ নয়, বরং তা সবসময়ই নিত্যনতুন রূপে প্রকাশিত হয়।

প্রকৃতিতে দ্বন্দ্বতত্ত্ব রয়েছে—সার্ত্র্ মার্কস্‌বাদীদের এই মতের বিরোধিতা করেছেন। ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্বতত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যায়—এই মতের বিরুদ্ধে সার্ত্র্ অনেক বছর ধরেই তীব্র আক্রমণ চালিয়েছেন। স্তালিনবাদী, ট্রট্‌স্কীবাদী এবং অনেক গোঁড়া মার্কস্‌বাদী ইতিহাসের দ্বন্দ্বতত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে স্বাধীন বা স্ব-শাসিত (autonomous) প্রকৃতির দ্বন্দ্বতত্ত্বের ধারণার ওপর নির্ভর করেছেন। কজেভ্ এবং হাইপোলাইট উভয়েই দ্বন্দ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রকৃতির দ্বন্দ্বতত্ত্বের ধারণাকে স্পষ্ট ভাষায় বাতিল করেছেন। মার্লো পঁতিও সার্ত্র্-এর বক্তব্যকেই সমর্থন করেছেন।

প্রকৃতির দ্বন্দ্বতত্ত্বের বিরুদ্ধে সার্ত্র্-এর আপত্তি ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে প্রথম 'লে তঁ মদার্ন' পত্রিকায় 'জড়বাদ ও বিপ্লব' শীর্ষক প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী ১৫ বছর ধরে সার্ত্র্ নানা সময়ে এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে গারোদি, হাইপোলাইট এবং জাঁ ভিজিয়ের-এর সংগে সার্ত্র্ একই বিষয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন।*

তাঁর মূল বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সার্ত্র্ 'ক্রিটিক' গ্রন্থে এবং বিতর্ক সভায় যা বলেছেন তা হলো এই যে, যাঁরা বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণ (scientific evidence)-কে প্রকৃতির দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন—পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনের উদ্ভব, বিরোধী শক্তি-সমূহের নীতি ইত্যাদি—তাঁরা অর্বাচীন (naive)। মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান মানুষের দ্বারাই সৃষ্ট (human construct) এবং তা কখনই প্রকৃতিকে মানবিক সত্তার (human reality) চেয়ে বেশী মাত্রায় প্রকাশ করে না। যদি

* ৬,০০০ ঐ লোক ঐতিহাসিক বিতর্কসভায় যোগদান করেছিল।

বলা যায় যে, প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক প্যাটার্ন বা ছাঁচ দ্বান্দ্বিক, তাহলে বলতে হয় যে, কেবলমাত্র মানবিক বুদ্ধিই দ্বান্দ্বিক, প্রকৃতি নিজে দ্বান্দ্বিক নয়। প্রকৃতির দ্বন্দ্বতত্ত্বের দাবীর স্বীকৃতির বিপদ এই যে, এটি মানবিক সত্তাকে বাহ্যিক জগতের নিয়ম সমূহের ওপর নির্ভরশীল বলে গণ্য করে। সার্ত্‌র্‌ অস্বীকার করেন না যে, মানুষের অবস্থান প্রকৃতিতেই এবং প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রক্রিয়াসমূহ মানব জীবনের পূর্ব-শর্ত। যা তিনি অস্বীকার করেন তা হলো এই যে, মানুষের জ্ঞান জড়ের মডেলে 'রূপান্তরিত হতে পারে। সার্ত্‌র্‌ বলেন যে, মানবিক সত্তা (human reality) ভৌত-রাসায়নিক সত্তা (physico-chemical reality) থেকে আলাদা। প্রকৃতির দ্বন্দ্বতত্ত্বের সমর্থকগণ প্রকৃতির ওপর মানবিক ধারণা (human ideas) আরোপ করেন এবং তারপর এই জ্ঞানকে আরোপ করতে চান মানবিক সত্তার ওপর, যাতে মনে হয় এর উৎপত্তিস্থল হলো প্রকৃতি। নির্বিচারে তাঁরা প্রকৃতি সম্পর্কিত তাঁদের ধারণাকে অতিমানবিক হিসেবে অস্তিত্বশীল (existing superhumanly) বলে মনে করেন। সার্ত্‌র্‌ তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি যুক্তি দিয়েছেন। প্রথমত, দ্বন্দ্বতত্ত্ব এমন বাস্তব সামগ্রিকতা নিয়ে কাজ করতে পারে যেগুলি মানুষ তার কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে গড়ে তোলে। কিন্তু যেহেতু প্রকৃতি একটি সুশৃংখল সামগ্রিক ব্যাপার নয়, যেহেতু প্রকৃতির মধ্যে আমরা পাই আভ্যন্তরীণ ঐক্যহীন বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন সামগ্রিকতা, সুতরাং প্রকৃতির অনৈক্যই আমাদের বাধা দেয় প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে কোন সার্বিক দ্বন্দ্বমূলক ব্যাখ্যা প্রয়োগ করতে।

দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত বিরোধ ইতিহাসের অভ্যন্তরে ক্রিয়া করে, সেগুলির সংগে প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকার বিরোধের কোন মিল নেই। সামাজিক বিরোধ সমূহের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতার (mediation) মাধ্যমে সামাজিক পক্ষগুলির মধ্যে আঙ্গিক মিথস্ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভৌত রাসায়নিক ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে এ ধরনের কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। নিছক বস্তু (Practio-inert) হলো বিচ্ছিন্ন এবং সেখানে কোন দ্বন্দ্বমূলক 'গতির সম্ভাবনা নেই।

তৃতীয়ত, সমাজ ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমরা ভেতর থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি, এবং সেগুলিকে আমরা তাদের যথার্থরূপে জানতে পারি। কেননা, সেগুলি মানুষের সিদ্ধান্ত ও কর্মের ফল। কিন্তু ভৌত ঘটনাপ্রবাহ বাহ্যিক ব্যাপার। :মানুষের অন্তর্দৃষ্টির সামনে এগুলি অস্বচ্ছ।

দ্বান্দ্বিক জড়বাদ বা বস্তুবাদের সমালোচনার ভিত্তি সার্ত্র্ খুঁজে পান 'দ্বান্দ্বিক জড়বাদ' প্রত্যয়টিতে নিহিত অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতার (confusion) মধ্যে। সার্ত্র্-এর কাছে দ্বান্দ্বিক জড়বাদ বা বস্তুবাদ প্রত্যয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। 'জড়বাদ ও বিপ্লব' শীর্ষক প্রবন্ধে সার্ত্র্ বলেছেন যে, যুবকদের বা তরুণদেব সামনে হেগেলীয় ভাববাদ ও জড়বাদের (বস্তুবাদের) মধ্যে কোন একটিকে গ্রহণ কবার জন্য যে প্রস্তাব রাখা হয় তা নিন্দনীয়। সার্ত্র্ লক্ষ্য করেছেন যে, এটা লোকেব সামনে তুলে ধরা হয় যে, হেগেলীয় ভাববাদ বিষয়ী-গত, অবৈজ্ঞানিক, ও অযথার্থ এবং যদি তারা হেগেলীয় ভাববাদকে বর্জন করে, তাহলে এর একমাত্র বিকল্প হলো জড়বাদকে গ্রহণ করা, আর এই জড়বাদই হলো দ্বান্দ্বিক জড়বাদ। একদিকে হেগেলীয় ভাববাদ এবং অন্যদিকে জড়বাদ (বস্তুবাদ) এভাবে বিকল্প হিসেবে এই দুটিকে উপস্থিত করা অনুচিত বলেই সার্ত্র্-এর অভিমত।

ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক প্রকৃতি ব্যাখ্যা প্রসংগে সার্ত্র্ বলেছেন যে, জগতের যাবতীয় ঘটনাবলী পারস্পরিক সম্পর্কে সম্পর্কিত, এবং একটি অখণ্ডরূপ হিসেবে জগতের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব, একথা নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া যায়। দ্বন্দ্বতত্ত্বের সারধর্মই হলো অখণ্ডতা বা সমগ্রতা (Totality)। দ্বান্দ্বিকতায় ঘটনাগুলি কখনই বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপিত হয় না ; এক আন্তর সম্পর্কের দ্বারা ঘটনাগুলি সম্পর্কিত। কিন্তু দ্বন্দ্বতত্ত্বের এই ধারণার সংগে জড়বাদের (বস্তুবাদের) সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না, কারণ, জড়বাদের ব্যাখ্যার উপাদানগুলি পরিমাণগত। ফলে, এগুলি স্বাধীন এবং একে অন্যের সংগে সংশ্রবহীন, পারস্পরিক সম্পর্কবর্জিত। আন্তর সম্পর্ক এখানে অনুপস্থিত। সুতরাং, সার্ত্র্-এর কাছে দ্বন্দ্বতত্ত্ব গ্রহণীয়, কিন্তু দ্বান্দ্বিক জড়বাদ (বস্তুবাদ) কদাপি নয়। দ্বান্দ্বিকতা ও জড়বাদ—এ দুয়ের মধ্যে কোন প্রকার সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না। সার্ত্র্-এর মতে, জড়বাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব বলে কিছু হতে পারে না। সার্ত্র্ বিশ্বাস করতেন যে যদি প্রকৃতির দ্বন্দ্বতত্ত্ব (Dialectic of nature) রাখা হয়, তাহলে তথাকথিত মার্কস্‌বাদীরা যে বিপ্লবের অন্বেষণ করেন, তা বাতিল হয়ে যাবে। জ্ঞান-তাত্ত্বিক নীতি হিসেবে প্রকৃতির দ্বন্দ্বতত্ত্ব বজায় রাখলে সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্য যে চিন্তা ও চেতনা প্রয়োজন তা অসম্ভব হয়ে পড়বে। জড়বাদ-কে 'একান্তভাবেই সামঞ্জস্যহীন' এবং 'অতিকথা' (Myth) হিসেবে বর্ণনা করে সার্ত্র্ বলেছেন যে, জড়বাদকে গ্রহণ না করে দার্শনিকের কাজ হবে সত্যিকারের বিপ্লবের শক্তির যথাযথ বিবরণ দেওয়া, যার শুরু হবে বৈপ্লবিক

মনের বিশ্লেষণ দিয়ে। সার্ত্র্-এর মতে, বিপ্লবী হলেন নির্যাতিত এবং যে সমাজ নির্যাতন করে সেই সমাজের কেন্দ্রবিন্দু (Keystone)। বিপ্লবীর বর্ণনা দিতে গিয়ে সার্ত্র্ বলেছেন, "বিপ্লবী তাঁকেই বলা হবে যিনি তাঁর নিজ পরিবেশ (বা পরিস্থিতি)-কে পাল্টানোর জন্য আবশ্যিকভাবে ঐ পরিবেশকে উত্তরণ করতে সক্ষম।"[১৩] বিপ্লবী সব সময়ই বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সচেষ্ট থাকবেন এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করবেন। সার্ত্র্ বলেছেন, বিপ্লবের মাধ্যমেই মানুষের মুক্তি সম্ভব, মনুষ্য-পরিবেশ ও জগতের পরিবর্তন সম্ভব, আর এই বিপ্লব নিয়ে আসার ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই আছে। একজন বিপ্লবীর কাছে 'জগতকে পরিবর্তন করার জন্য কর্ম' সবসময়ই 'জগৎ সম্পর্কিত জ্ঞান'-এর চেয়ে প্রাধান্য পায়। পরিবেশ বা পরিস্থিতি উত্তরণের যে সম্ভাবনা মানুষের আছে তাই হলো স্বাধীনতা। সার্ত্র্-এর কাছে মানুষের সত্তা তার বাস্তবজীবনে অংশ গ্রহণ ছাড়া আর কিছুই নয়। কর্মের মধ্যেই অস্তিত্ব আর বাস্তবতা। মানুষের রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা। ভবিষ্যৎ রচনার মাধ্যমেই মানুষের স্বাধীনতা প্রকাশ পায়, আর এই স্বাধীনতার ব্যাখ্যা জড়বাদ কিছুতেই দিতে পারে না।

সার্ত্র্ জোরের সংগে ঘোষণা করেছেন যে, মানুষ একান্তভাবেই স্বাধীন। বর্তমানকে না চাওয়াটাই স্বাধীনতা। না-চাওয়া বর্তমানকে অতিক্রম করে চাওয়া-ভবিষ্যতের দিকে মনুষ্যসত্তার যে উত্তরণের ইচ্ছা, যে যাত্রা, তাকে সার্ত্র্ খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। সার্ত্র্ বলেছেন, মানুষের এই যে স্বাধীনতা তাকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে; এই ইতিহাস শুধুমাত্র স্বাধীন ব্যক্তি মানুষের ইতিহাস নয়, এই ইতিহাস বিপ্লবীর ইতিহাস, ব্যক্তিকে এখানে সমাজের কোন শ্রেণীর সদস্য হিসেবেই বুঝতে হবে। ইতিহাসের পরিবর্তনের শক্তি স্বাধীন ব্যক্তি নয়, বরং একটি শ্রেণী, ব্যক্তি যার সদস্য। একজন ব্যক্তির শত্রু আর একজন ব্যক্তি নয়, বরং একটি শ্রেণীর (ব্যক্তি যার সদস্য) শত্রু আর একটি শ্রেণী। আর, এই শত্রুতার কারণ হলো জাগতিক বস্তুর অপ্রাচুর্যতা (scarcity of material goods)। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষের ইতিহাস আসলে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস ছাড়া কিছু নয়। এখানে একটু যত্ন সহকারে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, সার্ত্র্ কোন কোন ক্ষেত্রে মার্কস্বাদের সমালোচনা করলেও মার্কস্বাদী হিসেবে তাঁর রূপান্তর (conversion) ঘটতে শুরু করেছিল ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দ থেকেই। পরবর্তী-

১৩. **Mary Warnock, Existentialism.**

কালে 'সার্চ ফর অ্যা মেথড' এবং 'দ্য ক্রিটিক অব্ ডায়েলেকটিক্যাল রীজন' প্রকাশিত হবার পর সার্ত্র্ মার্কস্-অনুগামী হিসেবেই বিশ্বদরবারে চিহ্নিত হয়েছেন। তবে জড়বাদকে সমালোচনা করে তিনি বলেছেন যে, নিয়ন্ত্রণবাদী হওয়ার জন্য জড়বাদ সকল মানুষকে আচরণের ছাঁচে রূপান্তরিত করেছে, যা বিপ্লবীর চরিত্রকে প্রতিফলিত করে না। সার্ত্র্-এর মতে, "বৈপ্লবিক দর্শন হলো অতিক্রমণের দর্শন, উত্তরণের দর্শন, স্বাধীনতার দর্শন।"[১৪] 'বিশ্বে নির্দিষ্ট কিছু কর্তব্য ও মূল্য (values) আছে যা প্রদত্ত'—ভাববাদের এই শিক্ষা বিপ্লবীকে যেমন ঠকায়, তেমনি 'পরিবেশ বা পরিস্থিতি অতিক্রমণের ক্ষমতা মানুষের নেই'—'জড়বাদের এই শিক্ষাও বিপ্লবীকে ঠকায়। সার্ত্র্ সেজন্যেই মার্কস্‌বাদের কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণাকে বজায় রেখে অস্তিবাদের সাহায্যে মার্কস্‌বাদকে পূর্ণায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে এটাই অস্তিবাদের অবদান। বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যের জন্য "সার্ত্র্ জড়বাদী অতিকথার (materialist myth) প্রয়োজনীয়তা, অন্ততঃ অতীতে, স্বীকার করেছেন। কিন্তু দার্শনিক এবং বিপ্লবী হিসেবে তিনি এই 'দৈত্য'-এর (Monster) সুদূরপ্রসারী কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন এবং নিজে অ-জড়াত্মক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে বিপ্লবের একটি বিকল্প মতবাদ গঠন করার চেষ্টা করেছেন।"[১৫]

সার্ত্র্ বলেছেন যে, নির্বিচারী মার্কস্‌বাদীরা দ্বান্দ্বিক জড়বাদ (বস্তুবাদ)-কে এক ধরনের অদ্বৈতবাদে (Monism) রূপান্তরিত করেছেন, যা ইতিহাসকে বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করতে চায়। কিন্তু তাহলে দ্বান্দ্বিক জড়বাদ বলে কিছু হতে পারে না। "দ্বান্দ্বিক নিয়ম বলতে সার্ত্র্ কোন অন্ধ যান্ত্রিক নিয়মকে বোঝেন নি। এ হলো—জীবন্তবাস্তব (lived reality), যা বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে উৎসারিত হয় এবং যা দ্বান্দ্বিকতাকে সূচিত করে। বাইরে থেকে এই নিয়ম মানুষের ওপর ক্রিয়া করে না। এই জড়জগৎ বস্তুজগৎ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্র; মানুষ ছাড়া এই জগৎ নিষ্ক্রিয় ও অ-দ্বান্দ্বিক···।"[১৬]

সার্ত্র্-এর মতানুসারে, মানুষই ইতিহাস সৃষ্টি করে প্রদত্ত শর্তাবলী ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে। ক্যামুর এক প্রশ্নের উত্তরে সার্ত্র্ এক সময় বলেছিলেন,···'ইতিহাস-সৃষ্টিকারী মানুষ ছাড়া ইতিহাস বিমূর্ত ও নিশ্চল

১৪. M. Grene, Introduction to Existentialism.

১৫. ঐ

১৬. Wilfred Desan, The Marxism of Jean Paul Sartre.

একটি ধারণা'। প্রসংগত উল্লেখ করা যায় যে, সার্ত্র্ সমস্ত রকম নিয়ন্ত্রণবাদেরই বিরোধী ছিলেন। ফ্রয়েডের মানসিক নিয়ন্ত্রণবাদ যেমন তিনি গ্রহণ করেননি, তেমনি প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়—এ বক্তব্যও তিনি স্বীকার করেননি। আসলে, সার্ত্র্ ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সবসময়ই বজায় রাখতে চেয়েছেন, এমন কি মার্কস্ীয় দর্শনের কাঠামোর মধ্যেও। মার্কস্বাদকে 'পূর্ণায়িত' করার জন্য স্বাধীনতার ঐ ধারণা একান্ত অপরিহার্য বলেই তিনি মনে করতেন, আর স্বাধীনতার ঐ ধারণার ওপরই নির্ভর করছে সার্ত্র্-এর দ্বান্দ্বিক যুক্তিপদ্ধতি।

মার্কস্ীয় মতাদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী হলেও সার্ত্র্ মার্কস্বাদে একটি শূন্য স্থান আবিষ্কার করেছেন এবং প্রাক্সিসের সাহায্যে ঐ শূন্যস্থান পূরণের প্রয়াসে ব্রতী হয়েছেন। সার্ত্র্ বলেছেন, আমরা যে স্বাধীনতার কথা বলি তা জাগতিক অপ্রাচুর্যের সংগে সংগতিহীন। প্রাচুর্যের অবস্থায় মানবসমাজে সাধারণতঃ বিরোধ বা সংঘাত হয় না। সার্ত্র্ বলেছেন, "প্রয়োজন বা অভাবের (need) মতো অপ্রাচুর্যও পারস্পরিকতার নেতিবাচক, বিরোধী সম্পর্কসমূহের মধ্যে মানুষের বহুত্বের (multiplicity of men) বাস্তব ক্ষেত্রকে ঐক্যবদ্ধ করে।"[১৭] অপ্রাচুর্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি ব্যক্তিই যখন কোন বস্তু ভোগ করে (consumes) তখন সে তা করে প্রত্যেককে বঞ্চিত করে। অপ্রাচুর্যের ব্যাখ্যা প্রসংগে সার্ত্র্ বলেছেন যে, এ ব্যাপারে প্রতিটি গোষ্ঠীই (group) অন্য গোষ্ঠীকে তার নিজ অস্তিত্ব বা সন্তুষ্টিবিধানের বাধাস্বরূপ বা বিপদস্বরূপ মনে করে। সার্ত্র্ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, এই অপ্রাচুর্য মানুষেরই সৃষ্টি এবং অপ্রাচুর্যই বিরোধ বা সংঘর্ষ নিয়ে আসে। শিল্পকরণকে অপ্রাচুর্যের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি উপায় মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু শিল্পকরণের সংগে আসে শ্রেণীসংগ্রাম, জটিলতা, উদ্বেগ, উৎপাদিত সামগ্রী থেকে শ্রমিকের বিচ্যুতি, সহকর্মী থেকে বিচ্যুতি এবং সর্বোপরি আত্মচ্যুতি। এ ছাড়া, শিল্পকরণের ফলে নিজ নিজ দেশের উৎপাদিত পণ্য বা সামগ্রীর জন্য বাজার সৃষ্টি করতে গিয়ে পরস্পরের সংগে বিভিন্ন দেশের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ঘটনাও ঐতিহাসিক সত্য। বস্তুতপক্ষে সার্ত্র্ তাঁর 'ক্রিটিক' গ্রন্থে বিরোধ বা সংঘর্ষের বিশ্লেষণ করেছেন আন্তর্ব্যক্তিক পরিপ্রেক্ষিতে। সমগ্র মানবিক অভিযান-ই এক অর্থে অপ্রাচুর্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। অপ্রাচুর্যই ইতিহাসেরচালিকাশক্তি। আমরা যা, অপ্রাচুর্যই আমাদের তা তৈরি করেছে। জাগতিকতা (Materiality) অপ্রাচুর্যের

১৭. **Mark Poster, Existential Marxism in Post-war France.**

আকারেই মানবিক পরিবেশে দেখা দেয়, এবং অপ্রাচুর্য ও তা থেকে উত্তরণের জন্য যে সংকল্প তা মানবিক প্রাক্সিসকে প্ররোচিত (Motivates) করে।

সার্ত্র্‌-এর মতানুসারে, অপ্রাচুর্য শুধু ভোগের (consumption) বিষয় নয়, কেননা, ভোগ দ্বান্দ্বিকভাবে উৎপাদনের সংগে সম্পর্কিত। শুধু-মাত্র যে শ্রমের অসম বিভাগ আছে তা নয়, শ্রম নিজেই মানুষের ভারাক্রান্ত অবস্থাকে সূচিত করে। অপ্রাচুর্য দূর হবে যদি পণ্য দ্রব্য সমভাবে বণ্টিত হয় এবং শ্রম যদি অটোমেশনের মাধ্যমে জীবনের প্রান্তিক ব্যাপারে (Marginal fact) পর্যবসিত হয়। এই সমস্ত উপায়ে অপ্রাচুর্য সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নিষ্ক্রিয় কাঠামো (inert structure) তৈরি করে, যার দ্বারা ব্যক্তির কাছে বা গোষ্ঠীর কাছে অন্য সকল ব্যক্তি অ-মানবিক (inhuman) এবং 'সম্ভাব্য বর্জনীয়' (Possible expendable) হিসেবে চিহ্নিত হয়। প্রথম অনন্বয় বা চ্যুতির (alienation) উদ্ভব হয় এভাবেই "যখন ব্যক্তির প্রাক্সিস বা কর্মকাণ্ড তার নিজের অভাবের (need) সন্তুষ্টি বিধানের পর তার নিজের বিরুদ্ধেই দাঁড়ায় এবং সামাজিক পরিস্থিতির মাধ্যমে তার কাছে 'অপর' (other) হিসেবে পোঁছায়, যেহেতু অপর-কে বর্জনীয় বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে…।"[১৮] সার্ত্র্‌-এর কাছে "অপ্রাচুর্য হলো মানবিক সম্পর্ক-সমূহের বাস্তবকরণের (Reification) বিমূর্ত ও মৌলিক বা প্রধান উৎস…।"[১৯] মানবিক ব্যাপারে (human affairs) অপ্রচুর জড়বস্তুর মধ্যস্থতাই (Mediation) হলো শোষণ, হিংসা এবং সকল প্রকার অমঙ্গলের উৎস। অপ্রাচুর্য ব্যক্তিক প্রাক্সিস বা কর্মকাণ্ডের বিকৃতি নিয়ে আসে, যেহেতু প্রতিটি ব্যক্তিই অপরের কাছে বিষয়গতভাবে বিপদ্‌জনক। আরো গভীরভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, মানুষের যে শ্রম বস্তুর ওপর কার্যকরী হয় তার অভিপ্রেত অর্থ হারিয়ে যায় এবং মানুষকে বস্তুর মতো উপস্থিত হতে বাধ্য করে। এই প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির প্রাক্সিস 'অপর'-এর দ্বারা 'চুরি' হয়ে যায় এবং তার অভিপ্রেত অর্থের পরিবর্তন ঘটে। এই প্রসংগে সার্ত্র্‌ চীনদেশের একটি ঘটনার উল্লেখ করে উদাহরণ দিয়েছেন। চীন দেশে প্রতিটি কৃষকই চাষ করার জন্য জংগল কেটে ফেলে পরিষ্কার করেছিল। কিন্তু তা করতে গিয়ে প্রতিটি চাষীই বন্যা হওয়ার অবস্থা পরোক্ষভাবে সৃষ্টি করে ফেলল। এক্ষেত্রে চাষীর প্রাক্সিস বা কর্মকাণ্ড তার কাছে ফিরে এলো 'বিপদ' (Threat) রূপে—এক পরিবর্তিত অর্থ নিয়ে।

১৮. **R. D. Cumming, The Philosophy of Jean-Paul Sartre.** ;
১৯. ঐ

মানবিক সম্পর্কের ওপর অপ্রাচুর্যের প্রভাব ইতিহাসের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে ; অপ্রাচুর্য উত্তরণের বা অতিক্রমণের দলবদ্ধ পরিকল্পনাই বস্তুত ইতিহাসের উদ্‌ঘাটন ঘটিয়েছে। সার্ত্র্-এর কাছে অপ্রাচুর্য উত্তরণের সামাজিক প্রচেষ্টাতেই ইতিহাসের শুরু ও শেষ। পাশ্চাত্যে এবং সাম্প্রতিক-কালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিল্পকরণ প্রাচুর্যের অবস্থা সৃষ্টি করেছে, যদিও সার্ত্র একথা ভাবেন নি যে, অতি সত্বরই অপ্রাচুর্য বিদায় নেবে।

অনেক মার্কস্‌বাদী যদিও সার্ত্র্-এর 'অপ্রাচুর্য'-এর ধারণার প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন, সার্ত্র্ কিন্তু বিশ্বাস করেন যে, মার্কস্‌বাদের সংগে এই ধারণা সামঞ্জস্যপূর্ণ বা সংগতিপূর্ণ। মার্কস্ যে ''উদ্বৃত্ত মূল্য' এবং কৃৎকৌশলগত অগ্রগতির প্রাথমিক স্তরেও শোষণের অস্তিত্বের কথা বলেছেন, এবং তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা কিন্তু, সার্ত্র্-এর মতে, সংঘটিত হয়েছে অপ্রাচুর্যের ব্যাপকতর বা বিস্তৃততর কাঠামোর মধ্যে। অপুষ্টির (undernourishment) ব্যাপকতর শর্তের মধ্যে অধিকাংশ কৃষকদের আরো গভীর অপুষ্টিজনিত কষ্টে ঠেলে দিয়ে একজন উচ্চবিত্তের (elite) আরো সুখভোগ করা সম্ভব। অথচ, অসম বণ্টন না হলে, অর্থাৎ সমভাবে সম্পদ বণ্টিত হলে, কষ্ট কম হতো। 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে উল্লিখিত মার্কসের 'অপরিহার্যতা বা প্রয়োজনের রাজত্ব-এর (Reign of necessity) ধারণার সংগে সার্ত্র্-এর 'অপ্রাচুর্য'-এর ধারণার তুলনা করে চলে। এটা অটো-মেশনের আগে সমাজ ও প্রকৃতির সম্পর্ককে নির্দেশ করে, যেখানে মানব শ্রম বর্তমান অভাব বা প্রয়োজনের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করতে পারে নি।

সার্ত্র্-এর মতে, ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের অন্যতম কুফল হলো এই যে, তা নতুন নতুন অসমর্থনযোগ্য অপ্রাচুর্যের সৃষ্টি করে, যেমন, অতি-উৎপাদনের (over-production) সময় পণ্য-ভোগীদের (consumer) অপ্রাচুর্য। সার্ত্র্ দেখাতে চেয়েছেন যে, শুধুমাত্র জাগতিক বস্তুর অপ্রাচুর্যই বিষয়গত শোষণ (objective exploitation) নিয়ে আসে না ; এর মধ্যে বসবাসকারী মানুষ ফলস্বরূপ বিচ্ছিন্নতা বা চ্যুতিকে গ্রহণ করে। অপ্রাচুর্যের ওপর গঠিত সমাজে শ্রমিক শ্রেণী কখনই একে অন্যের 'ভাই' বা 'বোন' হিসেবে থাকতে পারে না, থাকা সম্ভব নয়। সার্ত্র্-এর বক্তব্য হলো, অপ্রাচুর্যের বাস্তব ক্ষেত্রে মানবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-ই বিচ্ছিন্নতার ভিত্তি। এর বিস্তৃতি কেবলমাত্র পরিমাণগত অপর্যাপ্ততার বিষয়গত অস্তিত্বের ভিত্তিতে পরিমাপ করা যায় না, ব্যক্তিগণের সদর্থক পারস্পরিকতা থেকেও এর উৎপত্তি হতে পারে।

অপ্রচুর বস্তু (জড়) ব্যক্তিগণকে গোষ্ঠীতে গঠিত করে, যেখানে মানুষ জড়ের (matter) দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়। তাঁর একান্ত ঔপন্যাসিক হাতের স্পর্শে সার্ত্‌র্‌ সেই সব গোষ্ঠীব আশ্চর্য উদাহরণ দিয়েছেন, যেগুলিকে (গোষ্ঠী) তিনি 'পারম্পর্য' বা 'অনুক্রম' (series) নামে চিহ্নিত করেছেন। একটি বাস স্টপ-এ অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সম্পর্কের স্বরূপ কী? তাদেব একটি সাধারণ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে ; আর তা হলো বাস, যার মাধ্যম্যে বা যাকে কেন্দ্র করে তারা একত্রিত হয়েছে। তবু তারা একান্তভাবেই নিঃসঙ্গ। তাদের পারস্পরিকতা প্রায় সম্পূর্ণই নেতিবাচক ; তারা একে অন্যকে গ্রাহ্যই কবে না। একে অন্যেব পরিপ্রেক্ষিতে তারা অভিন্ন—প্রত্যেকেই এক একজন ব্যক্তি যে বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। বস্তুটি বা বাসটি, যা মানবিক শ্রমের ফল, ঐ সব লোককে গোষ্ঠী বা দলে রূপান্তরিত করেছে, যেখানে মানবিক উপাদান প্রায় অনুপস্থিত। বাস আসাব সময় যতোই এগিয়ে আসছে ততোই সেই সব লোক নিজেদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করায়—নিজেদেবকে একটি 'লাইন'-এ রূপান্তবিত করে। বাসে আসনেব অপ্রাচুর্য প্রত্যেককেই অন্য সকলের চোখে 'বস্তু' হিসেবে নির্ধারিত করছে। এই সব লোকেব একতা বস্তুত চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতার-ই নামান্তর। পুতুল-ঘরে শিশুর পুতুলগুলিব মতোই লাইনে দাঁড়ানো লোকগুলি একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন, পৃথক। পবস্পর থেকে এই যে বিচ্ছিন্ন হওয়া তা আসলে জড়েব (processed matter) মাধ্যমেই ঘটে থাকে। এখানে বাসটি বিশুদ্ধ জড় পদার্থ (raw matter) নয়, মানবিক শ্রমের ফল—প্রক্রিয়া জন্য জড়পদার্থ। সার্ত্‌র্‌ এর নাম দিয়েছেন 'প্র্যাকটিকো-ইনার্ট' (Practicoinert) বা 'নিছক বস্তু'।

মানুষ এবং জড়ের এই সমগ্রীকরণ মানবসমাজের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পটভূমিকে আমাদের কাছে উপস্থিত করে। প্রশ্ন উঠতে পারে, 'বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস্‌' গ্রন্থে সার্ত্‌র্‌ যে স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন, প্র্যাক্‌টিকো-ইনার্ট-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার কী অবস্থা? বাস্তবিকপক্ষে, সার্ত্‌র্‌ তাঁর স্বাধীনতার ধারণার খুব অল্পই পরিত্যাগ করেছেন ; বরং বলা যায় যে, তিনি সামাজিক ক্ষেত্রে জড়ের সক্রিয় দিককে আরো বিস্তৃত করে স্বাধীনতার ধারণাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। যদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা দেখি যে, ব্যক্তি জড় বস্তুতে তার বাস্তবতা বা সত্তা খুঁজে পায়, তাহলে তা সম্ভব হয় একমাত্র এই কারণে যে, সে তা করতে স্বাধীন। সার্ত্‌র্‌ স্বাধীনতা এবং অনন্বয়ের দ্বান্দ্বিকতার অপূর্ব উদাহরণ দিয়েছেন :

"অনন্বিত বা পরিবর্তিত হতে গেলে (To be alienated or altered),

ব্যক্তিকে অবশ্যই জীবন্ত সত্তা (organism) হতে হবে, যা দ্বান্দ্বিক ক্রিয়ার অধীন ; এবং অপরিহার্যতা ব্যক্তি এবং তার উৎপাদিত বস্তুর রূপান্তর হিসেবেই স্বাধীন প্রাক্সিসের মাধ্যমে 'অপর'-এর মধ্যে প্রকাশিত (revealed) হয়, আর এই রূপান্তর ঘটে ব্যক্তির উৎপাদিত বস্তুর দ্বারাই। অভাবের চাপ, প্রক্রিয়াজন্য বস্তুর প্রয়োজনীয়তা, 'অপর'-এর আদেশ (imperatives), তার নিজের অসহায়তা বা শক্তিহীনতা,—ব্যক্তির কাছে তার প্রাক্সিস এ সবই প্রকাশ করে এবং এগুলিকে অভ্যন্তরকরণ (interiorize) করে। তার (ব্যক্তির) স্বাধীন ক্রিয়া নিজ স্বাধীনতায় যা কিছু তাকে ধ্বংস করে, যেমন, অত্যন্ত বেশী মাত্রার কাজ, শোষণ, অত্যাচার, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি, তাকেই গ্রহণ করে। একথা বলার অর্থ হলো এই যে, বস্তু এবং অপর তাকে ধ্বংস করার জন্য এবং তাকে প্রক্রিয়াজন্য বস্তুতে রূপান্তরের জন্য তার স্বাধীনতাকেই বেছে নেয়…। শ্রমিকের এ ছাড়া অন্য পথ নেই ; মনোনয়ন বা নির্বাচন (choice) অসম্ভব…। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে থাকে প্রাক্সিস্…। এখানে স্বাধীনতা বলতে মনোনয়নের সম্ভাবনা বোঝায় না, বোঝায় প্রয়োজনের বা চাহিদার (Requirement) আকারে চাপ (constraint) সহ্য করে বাস করার অপরিহার্যতা, যা প্রাক্সিসের দ্বারা পরিপূর্ণ হবে· ·।"[২০]

একথা সত্য যে, অনন্বয় দূরীকরণে পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য মনোনয়নের স্বাধীনতা ব্যক্তির নেই ; এটা হতে পারে একমাত্র দলবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধ কর্মের ফলে। তবে, অনন্বয়ী বা চ্যুতিকৃত কাঠামো বা আকার (alienating structure) সহ্য করা এবং আলোকিত করার স্বাধীনতা ব্যক্তির থাকে। সর্বত্র বিরাজমান (ubiquitous) ও সর্বব্যাপী (all-pervading) স্বাধীনতা দৈনন্দিন জীবনের পারম্পর্য-ভিত্তিক (serialised) কাঠামোতে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে (haunt) এবং ঐ কাঠামোর কাছে 'ভয়' বা 'বিপদ' হিসেবে উপস্থিত হয়। পারম্পর্য-ভিত্তিক কাঠামো ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে না ; বরং পারম্পর্য একটি দ্বান্দ্বিক অপরিহার্যতা উপস্থিত করে যাতে ব্যক্তি সেগুলিকে অভ্যন্তরকরণ বা মধ্যস্থকরণ (interiorize) করে।

সার্ত্র্-এর মতানুসারে, একমাত্র ব্যক্তিক প্রাক্সিসের মাধ্যমেই অনন্বয়ের দ্বান্দ্বিক প্রকৃতি বোধগম্য হতে পারে, অথচ মার্কস্‌বাদীরা ব্যক্তিক প্রাক্সিসের মুহূর্তকে দমন করেন বা গোপন করেন। সার্ত্র্-এর অস্তিবাদী মার্কস্‌বাদ হলো অনন্বয়ে বাস করা রূপ ক্রিয়ায় ব্যক্তিকে দেখার একটি পন্থা বা উপায়। জড় থেকে উৎসারিত অনন্বয়ের বিভিন্ন প্রকারকেও তা বোধগম্য করে।

২০. R. D. Cumming, The Philosophy of Jean-Paul Sartre.

সার্ত্র্ চেষ্টা করেছেন মানসঘটনাবাদ মূলক সামাজিক তত্ত্বের অন্যতম মৌল অসুবিধা দূর করতে, যা বস্তুত ব্যক্তিচেতনার আভিমুখ্যতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। 'ক্রিটিক' গ্রন্থে সার্ত্র্ প্রক্রিয়াজন্য জড়ের কথাও বলেছেন। 'বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস' গ্রন্থে সার্ত্র্ যে জড়ের কথা বলেছেন তার নিজস্ব কোন তাৎপর্যময় শক্তি নেই। অপরপক্ষে, 'ক্রিটিক' গ্রন্থে 'প্র্যাকটিকো-ইনার্ট'-এর ধারণা জড়কে তাৎপর্যময় করে তুলেছে এবং তাকে বিচ্ছিন্ন করার শক্তি দান করে জীবন্ত করে তুলেছে। সার্ত্র্ এর মতে, মানবিক সম্পর্কমাত্রের নানা প্রকারে (mode), যেমন শ্রমের পুঁজিবাদী সংগঠনে, অনন্বয়ের মূল নিহিত নেই; আছে অপ্রচুর প্রক্রিয়াজন্য জড় কর্তৃক মানবিক সম্পক সমূহকে গভীরভাবে অভিভূত করার মধ্যে।

প্রক্রিয়াজন্য জড়কে শক্তিদান করলে মানুষের সত্তাবিজ্ঞানগত স্বাধীনতা (ontological freedom) কতদূর উপলব্ধি করা যাবে? সংক্ষেপে, অনন্বয়কে কতদূর দূর করা সম্ভব? সার্ত্র্-এর জবাবকে হেগেল এবং মার্কসের পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে।

অনন্বয়, বা 'চ্যুতি' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো, একজনের কাছ থেকে অন্যের সংযোগ-বিচ্ছেদের অবস্থা বা আচরণ; অন্যের মালিকানা হস্তান্তর, এবং মনের স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বিচ্যুতি। মার্কসের আগে হেগেল এবং ফয়ারবাখই অনন্বয় বা চ্যুতিতত্ত্বকে একটি দার্শনিক কাঠামোয় দাঁড় করান। অবশ্য মার্কস হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক চিন্তার কাঠামোকে মেনে নিলেও অভিনব বিষয় ও অর্থ আরোপ করে চ্যুতি-ধারণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন, এক নতুন মাত্রা যোগ করেন।

অস্তিবাদের জন্মের আগেই অনন্বয় নিয়ে আলোচনা করেছেন অনেকেই। ঐ ধারণাটি এতো বেশী মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রায় প্রতিটি পাশ্চাত্য দার্শনিকই এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন। এরিখ কাহলারের মতে, গোটা পাশ্চাত্য দর্শন মানুষের অনন্বয়বোধের অনুভূতিতে সংবেদনশীল। হেগেল ও মার্কস্ কর্তৃক শব্দটির ভিন্নার্থক ব্যবহার সত্ত্বেও সমাজবিজ্ঞান ও সমাজ দর্শনে ইংরেজী 'অ্যালিয়েনেশন' শব্দটির দ্বারা সাধারণত অনন্বয়কেই বোঝানো হয়। অনন্বয় হচ্ছে ব্যক্তির একটি সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা যখন সে তার সামাজিক অস্তিত্বের কিছু ক্ষেত্র থেকে নিজেকে চ্যুত বা অনন্বিত মনে করে।

হেগেলের মতানুসারে, যতোদিন মানুষ জগৎ এবং নিজের মধ্যে, বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে, পার্থক্য করবে ততোদিন অনন্বয় মানুষের অনিবার্য অবস্থা বা শর্ত। হেগেল বিশ্বাস করতেন যে, কেবলমাত্র চেতনার বা ধারণার

জগৎই (world of spirit or idea) সত্য এবং বিষয়ী ও জগতের মধ্যে পার্থক্য বিভ্রান্তি (delusion) ছাড়া কিছু নয়। হেগেল তাঁর 'ফেনোমেনোলজি অব্ মাইণ্ড' গ্রন্থে অনন্বয় বা চ্যুতি নিয়ে আলোচনা করেছেন বিশদভাবে। ঐ গ্রন্থে হেগেল মানুষের অভিজ্ঞতার অন্তর্নিহিত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। ঐ অভিজ্ঞতা সাধারণ জ্ঞানের অভিজ্ঞতা নয়, দার্শনিকের বিশুদ্ধ চৈতন্যের অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার প্রারম্ভে বিষয় চৈতন্য নিরপেক্ষ একটা স্থিতিশীল পদার্থরূপে দেখা দেয়, বিষয় ও বিষয়ী থাকে পরস্পর চ্যুত। জ্ঞানের অগ্রগতিতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, বিষয় ও বিষয়ী পরস্পর চ্যুত বা অনন্বিত থাকতে পারে না। তাঁর মতে, "জগৎ আমার, কিন্তু তাকে বস্তু হিসেবে বিবেচনা করে আমি আমার কাছ থেকে তা লুকিয়ে রাখি"। এই যে 'সরে যাওয়া' বা বিচ্ছিন্নকরণ (estrangement), আমরা যতো বেশী জানব ততোই তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যাকে আমার কাছ থেকে মিথ্যাভাবে আলাদা বা ভিন্ন করা হয়েছে তাকে পুনরায় অধিকার করা বা আমার মধ্যে লাভ করাই হলো জ্ঞান। জ্ঞানের অগ্রগতি বা বৃদ্ধি বস্তুত অনন্বয়ের অবস্থার হ্রাসকে সূচিত করে। ভাববাদী হেগেলের কাছে এমন কোন সত্য নেই যা শেষ বিশ্লেষণে আবশ্যিকভাবে জীবন্ত বিষয়ীর সত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। মানুষ যতোক্ষণ পর্যন্ত না মৃত বিষয়তাকে ধ্বংস করে এবং ধরাবাঁধা নিয়মের বাইরে নিজেকে চিনতে পারে, ততোক্ষণ এই জগৎটা তার কাছে বিচ্ছিন্ন। একথা মনে রাখা আবশ্যক যে, সামাজিক-অর্থনৈতিক বিরোধ হেগেলের কাছে আসলে চিন্তন সত্তা ছাড়া আর কিছু নয়। হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্বের সাধারণ আকারগুলি (General Categories) রক্তমাংসহীন বিমূর্ত চিন্তা। হেগেল পরমব্রহ্মের ধারণায় বিভিন্ন বিরোধের ঐক্য খুঁজে পেয়েছেন। চিন্তা ব্যতীত, ভাব ব্যতীত, অন্য কিছু জগতের মধ্যে নেই। আর, এই ভাববিবর্তন ঘটে দ্বান্দ্বিক নিয়মানুসারেই।

হেগেলের ভাববাদ ১৮২০ থেকে ১৮৪০ পর্যন্ত জার্মানীতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিল। অবশ্য এর অন্যতম কারণ হলো, হেগেলের দর্শন রাষ্ট্রের সহানুভূতি লাভ করেছিল। হেগেলের দর্শনের মধ্যে বৈপ্লবিক মনোভাবের প্রকাশ থাকলেও এর ব্যবহারিক দিকটি ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। রক্ত মাংসে গড়া ব্যক্তিমানুষ হলো পরম চিন্তার আলোকে উদ্ভাসিত একটি ছায়ামাত্র, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হেগেলের এই ধরনের বক্তব্যের একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল। এই জগতে পরমব্রহ্মের মূর্ত প্রকাশ হলো রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের মধ্যেই ব্যক্তি বিলীন হয়ে যাচ্ছে। চরম শক্তিশালী রাষ্ট্রের পথ বেয়ে হেগেলীয়

বিশ্বগ্রাসী পরমাত্মাবাদ বা পরমব্রহ্মবাদ তাই ফ্যাসীবাদের অশুভ ইংগিত দিয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাববাদী অধিবিদ্যার বৈশিষ্ট্য ছিল অনন্বয়বোধকে মানুষের অস্তিত্বের চরম অবস্থা বলে মনে করা। হেগেল তাঁর 'সায়েন্স অব্ লজিক' গ্রন্থে এই ধারণার বিকাশ ঘটান। এখানে তিনি বিষয়-বিষয়ীর সম্পর্কের মধ্যে জন্মগত স্ব-অনন্বয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। হেগেলের ধারণার মূল হলো 'জাইস্ট' (zeist)। এ হলো অসীম, অপরিমেয় এবং অন্তর্মুখী এক সত্তা। এ সত্তা নিজেকে বিশ্বচেতনার মধ্যে প্রকাশ করেছে, যেহেতু কোন সত্তাকে সচেতন হতে হলে তাকে প্রকাশ করতেই হবে। সত্তা তাকে জানার প্রয়োজনেই সৃষ্টি করতে বাধ্য হচ্ছে। এই সৃষ্টিকার্যের ফলে সত্তা তার নিজেকে বিষয়করণ (objectify) করছে, যেমন কোন নায়ক বা অভিনেতা তার চরিত্রের অভিনয়ে নিজেকে প্রতিফলিত করে, অথবা কোন ভাস্কর তার ভাস্কর্যের মধ্যে নিজেকে বিষয়করণ করে। বিষয়করণ হলো আত্মপ্রকাশ। 'ফেনোমেনোলজি অব্ মাইণ্ড' গ্রন্থে হেগেল বলেছেন যে, অনন্বয়ের অবস্থান বিষয়করণ বা বিষয়ভবন প্রক্রিয়ার মধ্যে, অর্থাৎ, অনন্বয়ের ভিত্তি হলো অন্যান্য বস্তু বা বিষয়ের সংগে আত্মার সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা, নিজের মধ্যে চূড়ান্ত ঐক্যের অভাব (its lack of final unity)।

হেগেল প্রশ্ন করেছেন, ব্যক্তি কীভাবে তার স্বাভাবিক ক্ষমতার উন্নতি করতে পাবে ? স্বতঃই (intrinsically) সে যা, তা কী করে সে হতে পারে ? এর উত্তরে তিনি বলেছেন যে, ভাষা, আদবকায়দা এবং লোকাচার বা লোক-নীতি অর্জন বা গ্রহণের দ্বারা, এক কথায় কৃষ্টি বা সংস্কৃতির দ্বারা গঠিত এবং পরিচালিত হয়ে, ব্যক্তি স্বতঃই যা তা সে হতে পারে।

মার্কস্ হেগেলের অনন্বয়ের ধারণাকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু উভয়ের ব্যাখ্যায় পার্থক্য রয়েছে। 'প্যারিস ম্যানুস্ক্রিপ্ট্স্' সযত্নে অনুধাবন করলে আমরা দেখতে পাই যে, মার্কস্ অনন্বয়ের সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক মাত্রার (dimension) বদলে অনন্বয়ের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং কিছু মাত্রায় মনস্তাত্ত্বিক দিকের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অনন্বয়ের ধারণা বিশ্লেষণে মার্কস্ হেগেলের মতোই শুরু করেছেন, কিন্তু যতোই আমরা তাঁর 'ইকনমিক অ্যাণ্ড ফিলসফিক্যাল ম্যানুস্ক্রিপট্স্' অনুধাবন করি ততোই আমরা দেখি যে, মার্কস্ অনন্বয়ের ধারণায় নতুন নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। মার্কসের অনন্বয়ের ধারণার বিশ্লেষণের ভিত্তি হলো পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিকের স্বরূপের অসহায় ও অক্ষম অবস্থা।

অনন্বয়ের ধারণা অক্ষমতার অনুভূতির সংগে জড়িত। পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় পুঁজিশক্তির কাছে শ্রমিক একেবারে অসহায় ও অক্ষম। তার সামাজিক সম্পর্কগুলিও পুঁজিশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর ফলে, শ্রমিকের নিজ ব্যক্তিত্বের ওপর কোন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। যে সামাজিক সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত গড়ে ওঠে তা শ্রমিকের কাছে এক অপরিচিত শক্তি হিসেবে কাজ করে। এই অপরিচিত শক্তি হলো পুঁজিশক্তি, যা তার স্বাধীনতাকে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতাকে খর্ব করে। এ ধরনের এক অপরিচিত আবহাওয়ায় বাস করতে গিয়ে ব্যক্তির সামাজিক ও কর্মজীবনে এক অক্ষমতা ও অসহায়তার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। সে নিজেকে আর মনুষ্যক্রিয়া সম্পাদনে মুক্ত ও স্বাধীন বলে ভাবতে পারে না। সুতরাং অনন্বয়ের অনুভূতি সঞ্চারণের বাস্তব উপাদান হলো ঃ (১) পুঁজিপতির জন্য শ্রমিকের বাধ্যতা-মূলক শ্রম, (২) শ্রমিকের শ্রম-ফসল পুঁজিপতির দ্বারা শোষণ, এবং (৩) উৎপাদনের হাতিয়ারের মালিকানা থেকে শ্রমিকের বিচ্ছিন্নতা। শ্রমিক পুঁজি-পতির জন্যই পরিশ্রম করে। সে তার শ্রম ও শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যকে মজুরীর বিনিময়ে পুঁজিপতির হাতে তুলে দেয়। তাই পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় পুঁজিপতি যতো ধনী হতে থাকে, শ্রমিক ততোই গরীব হতে থাকে। শ্রমিক নিজেই পুঁজির জন্ম দিচ্ছে অথচ সে নিজেই স্ব-সৃষ্ট পুঁজির শিকার হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা যায় যে, শ্রমিক যা উৎপাদন করে তাকে নিজস্ব বলে ভাবতে পারে না,—তা তার কাছে একটি অপরিচিত বস্তু হিসেবেই দেখা দেয়। এই অপরিচিত বস্তু একটি স্বাধীন সত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। উৎপাদিত পণ্য হচ্ছে শ্রমিকের শ্রম-স্বাক্ষর (objectification of labour) বা শ্রমের বিষয়করণ। কারণ, এই শ্রম-ফসলের মধ্যেই সে তার শ্রমকে স্বাক্ষরিত করেছে। এই শ্রম-ফসল তার কাছে একটি ভিন্ন সত্তা—অপরিচিত বস্তু। শ্রমিক নিজেই তার উৎপাদিত বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন। নিজের উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে সে আর নিজেকে খুঁজে পায় না। মার্কসের মতে, অনন্বযের মূল ধারণাটা হলো বিষয়করণ। শ্রমিক তার শ্রমকে পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ার সংগে মিলিয়ে দেয়, আর এই মিলিয়ে দিতে গিয়েই সে নিজে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর স্বাভাবিক পরিণতি হলো, শ্রমের মধ্যে শ্রমিক নিজেকে ঘোষণা করার পরিবর্তে বরং অপমৃত্যু ঘটাচ্ছে। শ্রমের মধ্যে তখন শ্রমিকের সুখানুভূতি জাগে না। ধীরে ধীরে সে নিজেকে নিজের কাছ থেকেই অনন্বিত করে ফেলে,—তার আত্মচ্যুতি ঘটে ; ঘটে অন্যান্য মানুষের সংগেও তার অনন্বয়। মার্কস্ অনন্বয়ের ভিত্তি আলোচনা প্রসংগে-

বলেছেন যে, 'পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার শর্তাবলী বা অবস্থা শেষ পর্যন্ত শ্রমিকের মানব-প্রকৃতিকে অপবিত্র ও লঙ্ঘন করে, কারণ, এগুলি শ্রমিকের মর্যাদার (status) পরিবর্তন ঘটায়।

মার্কসের মতে, অনন্বয়েব প্রকাশ জীবনের নানা ক্ষেত্রে, অনন্বয়ের অর্থনৈতিক প্রকাশ পণ্যের জগতে, রাজনৈতিক প্রতিফলন রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান ও সমাজের বিরোধে এবং সামাজিক প্রকাশ সর্বহারার অস্তিত্বে। মার্কস্‌ তাঁর 'থিসিস্‌ অন ফয়ারবাখ'-এ অনন্বয় বা চ্যুতি উত্তরণে দর্শনকে প্রাক্সিসে পরিণত করার দাবী জানিয়েছেন। মার্কস দেখিয়েছেন, যে শ্রমিক শ্রেণী উৎপাদন-ব্যবস্থার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং যাদের শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছুই নেই, একমাত্র তারাই পারবে সমাজকে স্বাধীন করতে, শোষণমুক্ত করতে, সংযোগ-বিচ্ছেদের হাত থেকে রক্ষা করতে। শ্রমিক-উৎপাদন সম্পর্কের বৈপ্লবিক পরিবর্তন করে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই পারে চ্যুতি বা অনন্বয়-সমস্যার সমাধান করতে। অনন্বয় অতিক্রমণে মার্কস্‌ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে, শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজে কোন চ্যুতি বা অনন্বয় থাকবে না,—থাকবে নতুন মূল্যবোধ, সৃষ্টির আনন্দ।

মার্কস্‌ অভিযোগ করেছেন যে, হেগেল 'অনন্বয়' এবং 'বিষয়করণ' এই দুটিকে গুলিয়ে ফেলেছেন। অনন্বয় থেকে যখন হেগেল উত্তরণের পথ খুঁজেছেন, মার্কস্‌ তখন তাঁকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু বিষয়করণ থেকে যখন হেগেল উত্তরণের চেষ্টা করেছেন, তখন মার্কস্‌ তাঁকে সমালোচনা করেছেন। মার্কসের মতে অনন্বয়-অতিক্রমণ সম্ভব হলেও বিষয়করণ-অতিক্রমণ সম্ভব নয়। তাঁর মতে, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মই বিষয়করণকে সূচিত করে। পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বংস হলে অনন্বয় লোপ পাবে, কিন্তু সমস্ত রকম ক্রিয়া ও উৎপাদনের স্থায়ী আবশ্যিক দিক হিসেবে বিষয়করণ বর্তমান থাকবে। হেগেল ছিলেন 'অনন্বয়ের অবভাসবাদী' (Phenomenologist of alienation) আর মার্কস্‌ 'অনন্বয়ের সামাজিক ঐতিহাসিক'।

সার্ত্র্‌-এর মতানুসারে, মার্কস্‌ মূলতঃ যে অনন্বয় নিয়ে চিন্তিত ছিলেন তা হলো, উৎপাদন থেকে মানব-শ্রমের অনন্বয়, এবং এই অনন্বয়-সমস্যার সমাধান হতে পারে শ্রমিক-উৎপাদন সম্পর্কের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে। সার্ত্র্‌-এর চিন্তাধারার মূল কাঠামো মার্কসীয় হলেও মার্কসের অনন্বয়ের ধারণাটির ব্যাখ্যা সার্ত্র্‌-এর কাছে গ্রহণীয় মনে হয় নি। সার্ত্র্‌ বলেছেন যে, মার্কস্‌ তাঁর জীবিতকালে এমন সমাজের কথা ভাবতেও পারেন নি যেখানে মনুষ্যসৃষ্ট প্রযুক্তি বিপদজনকভাবে মনুষ্য-নিরপেক্ষ হয়ে উঠবে, মনুষ্যসৃষ্ট

যন্ত্র মানুষের ওপরই প্রভুত্ব করবে। সার্ত্র্-এর অস্তিবাদ এ ধরনের অনন্বয় নিয়েই ভাবিত, যা মানব-জীবনকে অসংগত করে তুলেছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আজকের মানুষ যান্ত্রিক শিল্পসভ্যতার চাপে পিষ্ট। মানব শ্রমের ফলে যন্ত্রশিল্পের মাধ্যমে বিকশিত মানুষের সৃষ্টি স্রষ্টাকেও আজ যেন ছাপিয়ে উঠেছে। সার্ত্র্-এর দর্শনে অনন্বয় বা চ্যুতি বিভিন্ন আকার নিয়েছে—জ্ঞানাত্মক এবং ক্রিয়াত্মক উভয়ই। তাই কখনও তা দার্শনিক বিশ্বাস-রূপে, কখনও আবেগীয় প্রতিন্যাস রূপে, কখনও বা ক্রিয়া বা কর্ম করার প্রবণতারূপে, আবার কখনও বা ক্রিয়ার গুণ রূপে প্রকাশিত।

সার্ত্র্-এর মতে, প্রত্যেক ব্যক্তির অস্তিত্বই অনুপম (unique), একক। তিনি ব্যক্তির স্বকীয় অস্তিত্বশীল শর্তকে কোন বুদ্ধিময় সত্তার কাছে, কিংবা সমাজের পায়ে মাথা খুঁড়ে মরতে দিতে নারাজ। ব্যক্তির মনোনয়নের বা নির্বাচনের (choice) স্বাধীনতার গুরুত্ব সার্ত্র্ কাছে বিশেষ তাৎপর্যবহ। নির্বাচন বা মনোনয়নের স্বশাসনের ওপরই, সত্তাবিজ্ঞানের ওপর নয়, সার্ত্র্ অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, এবং বলেছেন যে, স্বাধীন মনোনয়নের অধিকার থাকার জন্যই ব্যক্তি তার কর্মের জন্য দায়বদ্ধ, আর তা থেকেই তার মনে আসে উদ্বেগ বা মনস্তাপ। স্বাধীনতার এই দিকটিকে অস্বীকার করার অর্থই হলো আত্ম-প্রবঞ্চনা। স্বাধীনতাজাত দায়িত্ব থেকে জন্ম নেয় উদ্বেগ, আর তা থেকে ব্যক্তি পালিয়ে যেতে চায়,—এটাই আত্মপ্রবঞ্চনা। অন্যভাবে বলা যায়, নিজেকে নিজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর। সার্ত্র্-এই আত্মপ্রবঞ্চনার নাম দিয়েছেন 'ব্যাড ফেথ'। অস্তিবাদী হিসেবে সার্ত্র্-এর কাছে সিদ্ধান্ত, মনোনয়ন ও স্বাধীনতাই যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানে 'অনন্বয়' বা 'চ্যুতি' শব্দটির তাৎপর্য নিহিত আছে ব্যক্তির (স্ব-হেতু-সত্তা) বিষয়ে বা বস্তুতে (স্ব-স্থিত-সত্তা) পর্যবসিত হওয়ায়, স্বাধীনতাকে অস্বীকার করায়,—আত্মপ্রবঞ্চনায়। অনন্বয়ের ধারণাটি বিশ্লেষণ করে সার্ত্র্ দেখিয়েছেন যে, মানুষকে (স্ব-হেতু-সত্তা) বস্তু (স্ব-স্থিত-সত্তা) হিসেবে বিচার করলেই যতো গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। মানুষের যে আত্ম-অতিক্রমণের ক্ষমতা আছে, তার যে অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। সার্ত্র্-এর মতে, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যেই অনন্বয়ের বীজ নিহিত। অনন্বয়ের রূপ সার্ত্র্-এর কাছে তাই অন্যরকম।

আমরা যে ক্রমশই যন্ত্রের দাস হয়ে পড়ছি, তা দেখে সার্ত্র্ খুবই চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন। সার্ত্র্ দেখেছেন যে, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, অর্থনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নত হয়েও মানুষ আজ

অস্থির ও অবসাদগ্রস্ত। এই যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষকে করেছে একান্তই নিরাপত্তাহীন ও অনিশ্চিত। সার্ত্র্‌ তাই মানুষ ও জগতের সম্পর্ককে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। অনন্বয় বা চ্যুতির ধারণাটিও তাঁর হাতে এক নতুন ব্যাখ্যায় তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। 'বিয়িং অ্যাণ্ড নাথিংনেস্‌' গ্রন্থে অনন্বয়ের ধারণার বিশ্লেষণ পড়লে মনে হয় যে, অনন্বয় পরিস্থিতিমূলক (situational), স্থায়ী এবং তা দূর করা যাবে না। অনেকেই মনে করেন যে, এক্ষেত্রে সার্ত্র্‌-এর দার্শনিক বিশ্লেষণ হেগেলীয়। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক লেখাগুলি পড়লে দেখা যায় যে, তিনি অনেকটাই মার্ক্‌স্‌-ঘেঁষা।

যাই হোক্‌, তাঁর বহুবিতর্কিত 'ক্রিটিক' গ্রন্থটিতে সার্ত্র্‌ হেগেল ও মার্কস্‌ উভয়েরই বিরোধিতা করে বলেছেন যে, অনন্বয় মানুষকে একমাত্র জড়ের মধ্যস্থতার (mediation of matter) মাধ্যমে বিরক্ত বা হয়রান (plague) করে। অপ্রচুর জড়ই (scarce matter) অনন্বয়ের ভিত্তি এবং এর সাহায্যেই সার্ত্র্‌ বাস্তব ক্ষেত্রে নানাপ্রকার অনন্বয় এবং পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। কেননা কোন মাত্রায় অনন্বয় বিষয়করণ প্রক্রিয়ার অনুগমন করে, যেহেতু প্রাক্সিসের দ্বারা উৎকীর্ণ হয়ে বস্তু আরো গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী হয়ে মানুষের মুখোমুখি হয়। অপ্রচুর জড়ের দ্বারা গঠিত হয়ে বাস্তব ক্ষেত্র মানুষকে পৃথক করে, নিঃসঙ্গ করে, যেখানে প্রতিটি মানুষই একে অন্যের কাছে 'অপর' হিসেবে উপস্থিত হয়। এই 'অপরত্ব' (otherness) নানা মাত্রায় মানুষের মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি করে এবং যার দ্বারা প্রত্যেকেই অংশতঃ তার মানবিক চরিত্র হারিয়ে ফেলে।

যেহেতু সার্ত্র্‌ অপ্রাচুর্য-উত্তর সমাজের (Post-scarcity society) সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন, তাকে একথা মানতেই হবে যে, অনন্বয়ের নানা বিকার বা প্রকার (modes) হলো ইতিহাসগত এবং তা অপরিবর্তনীয় (immutable) নয়। সার্ত্র্‌ কর্তৃক বর্ণিত অনন্বয়ের প্রতিটি দিকই বস্তুত অপ্রাচুর্যের ইতিহাসের মধ্যে সীমিত, এবং অন্য কোন অবস্থাতেই তা প্রযোজ্য হবে না। অ-অপ্রাচুর্যের ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক গঠন বা আকার (কাঠামো) সার্ত্রীয় পরিকল্পনার গণ্ডীর বাইরে। যখন সত্তাবিজ্ঞানগতভাবে স্বাধীন (ontologically free) মানুষ এবং সত্তাবিজ্ঞানগতভাবে নিশ্চেষ্ট (inert) প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন হবে, তখন সবই বদলাবে। বাস্তবিক পক্ষে, দ্বান্দ্বিক যুক্তি আগে থাকতে এই ব্যাপারে সম্ভবত কোন সিদ্ধান্ত টানতে পারেনা, কারণ, গঠিত ইতিহাসগত কাঠামোর বোধগম্যতার (intelligibility of constituted historical structures) মধ্যেই তা সীমিত।

দ্বান্দ্বিক যুক্তি এবং স্বাধীনতা প্রসংগে সার্ত্র্

সার্ত্র্-এর দর্শনে 'স্বাধীনতা'র ধারণাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সার্ত্র্ যেভাবে দ্বান্দ্বিক যুক্তিকে বুঝেছেন বা বুঝিয়েছেন তা তাঁর স্বাধীনতার ধারণার ওপর ভিত্তি করেই। যা এখন আছে বা অস্তিত্বশীল তাকে অতিক্রম করে যা এখন নেই বা অনস্তিত্বশীল এবং যা মানব ইতিহাসের দ্বারা অভিক্ষেপিত (Projected), সেদিকেই দ্বান্দ্বিক যুক্তি অগ্রসর হয়।

সার্ত্র্-এর দর্শনে স্বাধীনতার ধারণাটির বিশ্লেষণ যেভাবে করা হয়েছে তা যেমন অভিনব, তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। হাইনিম্যান একদা মন্তব্য করেছিলেন যে, "সার্ত্র্-কে যদি বুঝতে চাও, তাহলে স্বাধীনতা, পরিস্থিতি এবং শূন্যতা (Negation) এই তিনটি ধারণাকে বুঝতে হবে।" 'বিয়িং অ্যান্ড নাথিং নেস্' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে স্বাধীনতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সার্ত্র্ বলেছেন যে, স্বাধীনতার ধারণাটি বিশ্লেষণ করার আগে প্রয়োজন 'কর্ম'-এর (Action) ধারণার বিশ্লেষণ করা। সার্ত্র্-এর দর্শন বিষয়ীর দর্শন, বিষয়ের দর্শন নয়। এই বিষয়ী তাঁর দর্শনে শুধুমাত্র চিন্তাশীল বিষয়ী নয়, কর্মোদ্যোগী এবং অনুভূতির কেন্দ্রও বটে। অস্তিত্বের এই সামগ্রিক রূপই সার্ত্র্-এর অস্তিবাদের আলোচ্য বিষয়।

সার্ত্র্-এর মতানুসারে, মানুষ সামগ্রিকভাবে অস্তিত্বশীল। বিচ্ছিন্নভাবে মানুষকে বিচার করা সংগত নয়। চিন্তা,

অনুভূতি এবং ইচ্ছা, এগুলিকে আলাদা আলাদাভাবে বিচারে করলে তা হবে বিমূর্তায়ন। মানুষ প্রথমে অস্তিত্বশীল এবং তারপর ক্রিয়াশীল হয় বা কর্মে প্রবৃত্ত হয়, এ ধারণা করা ঠিক নয়। বাস্তবিক পক্ষে, মানুষ প্রথম থেকেই ক্রিয়াশীল। সার্ত্‌র্‌-এর অস্তিবাদে 'মানুষ'-এর ধারণা স্থানুধর্মিতা বর্জিত এবং ক্রিয়াশীল গুণে গুণান্বিত। কর্মের আলোচনা প্রসংগে সার্ত্‌র্‌ শুরুতেই বলেছেন যে, "এটা বিস্ময়কর যে, দার্শনিকরা অনবরত নিয়ন্ত্রণবাদ ও ইচ্ছার স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করেন, দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ দিয়ে কেউ এক পক্ষকে, অবার কেউ অন্য পক্ষকে, সমর্থনও করেন, কিন্তু কেউই এই প্রসংগে কর্মের ধারণার মধ্যে নিহিত কাঠামোকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন নি।"[১]

'কর্ম'-এর ধারণা তাহলে কী ? সার্ত্‌র্‌-এর মতে, যে কোন ক্রিয়াই কর্ম নয়। কর্ম একান্তই ব্যক্তিগত এবং তা সমগ্র ব্যক্তিকেই জড়িয়ে রাখে। চিন্তা এবং আবেগ (Passion) উভয়ই কর্মের অন্তর্গত। চিন্তা, আবেগ এবং অন্তর্মুখী সিদ্ধান্ত ছাড়া কোন কিছুই 'কর্ম" নামের যোগ্য নয়। সার্ত্‌র্‌-এর কাছে বাহ্যিক ক্রিয়া এবং কর্ম সমার্থক নয়। কর্মে, সমগ্র ব্যক্তি ক্রিয়া করে বলে মানব-অস্তিত্বের রহস্য কর্মেই বিধৃত। বাহ্যিক ক্রিয়ার সাফল্যের দ্বারা কর্মের বিচার করা সংগত নয়। সার্ত্‌র্‌-এর অস্তিবাদ সেজন্যই প্রয়োগবাদ থেকে আলাদা। মানুষ শুধু কিছু ক্রিয়ার সমষ্টিমাত্র নয়, কিংবা কিছু ভূমিকা পালনকারী-মাত্র নয়। মানুষ হলো এক ঐক্য, যা নিজেকে বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করে, অথবা বলা যায়, বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি বা সৃষ্টি করে।

অনেককাল ধরেই নীতিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের সত্তার পথনির্দেশে করা। স্টোয়িক নৈতিকতা বা স্পিনোজার নীতিদর্শনের অর্থ মূলতঃ তাই। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট-ই প্রথম এমন একটি নৈতিকতার কথা বললেন যা মানুষের সত্তার চেয়ে কর্মকেই প্রাধান্য দিল। কাণ্টের নৈতিকতার ধারণা সেদিক থেকে প্রশংসনীয়। স্টোয়িক নৈতিকতা এবং স্পিনোজার নীতিদর্শন যেমন সার্ত্‌র্‌-এর কাছে তাৎপর্যহীন, তেমনি তাৎপর্য হীন পুরোনো ফ্যাকাল্টি-মনোবিজ্ঞানও। "আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি"—দেকার্তের এই বিখ্যাত নীতিটিও সার্ত্‌র্‌-এর কাছে গ্রহণীয় মনে হয় নি, কেননা আমি মুখ্যত একজন চিন্তাশীল বিষয়ী নই। আমি প্রথমে অস্তিত্বশীল। 'অস্তিত্ব' 'চিন্তার চেয়ে ব্যাপক এবং চিন্তার চেয়ে পূর্ববর্তীও।

১. Being and Nothingness, Sartre.

অস্তিত্বের অর্থই হলো স্বাধীনভাবে কর্ম ক'রে দায়িত্বশীল ব্যক্তি হয়ে বেঁচে থাকা। তাই সার্ত্র্‌-এর মতে, "আমি চিন্তা করি" এ-কথার বদলে বলতে হবে "আমি কর্ম করি"। জাগতিক ব্যাপারের সংগে জড়িয়ে থাকা বহুমাত্রিক মানবিক অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ, কর্মই হবে দর্শনের প্রস্থানবিন্দু, বিমূর্ত চিন্তাশীল দ্রব্য নয়। কর্মের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সার্ত্র্‌ বলেছেন, "কেবলমাত্র কর্মেই অস্তিত্ব মূর্ততা ও পূর্ণতা লাভ করে।"

সার্ত্র্‌ মানসঘটনাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মের বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, কর্মের একটি আভিমুখ্যতা রয়েছে, অর্থাৎ কর্ম সবসময়ই কোন উদ্দেশ্যাভিমুখী। ক্রিয়া মাত্রই যে কর্ম হতে পারেনা তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সার্ত্র্‌ বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি অন্যমনস্কভাবে বা অবহেলাভরে জলন্ত সিগারেটের টুক্‌রো ফেলে দিয়ে কারখানায় আগুন লাগায় বা বিস্ফোরণ ঘটায়, তা হলে তার ঐ কাজটিকে 'কর্ম' বলে চিহ্নিত করা যাবে না। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি কারখানায় আগুন লাগানোর জন্য বা বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য স্বেচ্ছায় জ্বলন্ত সিগারেটের টুক্‌রো ছুঁড়ে দেয় এবং এর ফলে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহলে তার ঐ কাজ 'কর্ম' নামে চিহ্নিত হবে। কর্ম তাই চেতন উদ্দেশ্যের উপলব্ধিকে সূচিত করে। কর্মের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে সার্ত্র্‌ বলেছেন যে, যা এখনও এখানে নেই তাকে এখানে পাওয়ার ইচ্ছা এবং তজ্জনিত যে ক্রিয়া তাই হলো কর্ম। কর্ম অভাববোধকে সূচিত করে। কোন প্রত্যাশার ভিত্তিতেই আমরা কর্ম করি। আমি এখনও যা নই, কী করে তা হয়ে উঠতে পারি—আমার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা একে কেন্দ্র করেই। এ জগৎই আমার সকল সম্ভাব্য কর্মের ক্ষেত্র, যা আমার ভবিষ্যৎকে সূচিত করে। সার্ত্র্‌ বলেছেন, "কর্ম হলো যা নয় তার প্রতি স্ব-হেতু-সত্তার অভিক্ষেপ (Prejection)।"২ কর্ম করার অর্থই হলো জগতের আকারকে পরিবর্তিত করা। মানুষের স্থান জগতের মধ্যে, বাইরে নয়, এবং মানবিক জগৎ ও চেতনার সংযোগ হয় কর্মের মাধ্যমেই। বর্তমানে আমি যা তাকে অস্বীকার করে ভবিষ্যতে আমি যা হতে চাই—একেই স্ব-হেতু-সত্তার অভিক্ষেপ বলা হয়েছে, আর তার জন্য যে সচেতন কর্ম তাকেই সার্ত্র্‌ 'স্বাধীনতা' বলেছেন। স্বাধীনতার যদি এই অর্থ হয়, তাহলে কর্ম ও স্বাধীনতা প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়, আর বস্তুত সার্ত্র্‌ বলেছেনই যে, সকল কর্মই স্বাধীন। হুসার্লের অনুসরণে সার্ত্র্‌ বলেছেন,

২. **Sartre, Being and Nothingness.**

চেতনা 'এখন যা আছে' তা থেকে 'এখনও যা নয়' তা হতে পারে। তাহলে 'এখনও যা নয়' তা হতে পারার সম্ভাবনার জন্যই কর্মের প্রয়োজন। কর্মের মূল রয়েছে তাই চেতনার লক্ষণের মধ্যেই। সার্ত্র'-এর মতে, কর্মক্ষেত্র হিসেবে জগৎকে প্রত্যক্ষ করার অর্থই হলো জগৎকে 'অপূর্ণ' (lack) হিসেবে প্রত্যক্ষ করা, যে অপূর্ণতা একমাত্র কর্মের মাধ্যমেই দূর করা সম্ভব। সেজন্যই সার্ত্র্‌ বলেছেন, "জগৎ যদি জ্ঞানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তাহলে কর্মের মাধ্যমে তা গঠিত হয়।"[৩]

কর্মের বিশ্লেষণ থেকে এটা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না যে, 'বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস্‌' গ্রন্থে সার্ত্র্‌ স্বাধীনতার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা মূলতঃ নেতিবাচক। "শূন্যতার (মানবচেতনার) কাঠামো হলো স্বাধীনতা বা স্বাধীনচেতনা··, স্বাধীনতাই চেতনার কাঠামো"[৪] —সার্ত্র্‌-এর এই বক্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য। অনীপ্সিত বর্তমান থেকে মনুষ্যসত্তার যে বিচ্ছেদবাসনা সেই নেতিবাচক চরিত্রটাই স্বাধীনতার বাস্তব সতা। "ভবিষ্যতের দিকেই চেতনার যাত্রা", আর সার্ত্র্‌-এর মতে, এটাই হলো স্বাধীনতা। সার্ত্র্‌ মনে করেন যে, স্বাধীন চেতনার কোন সংজ্ঞা সম্ভব নয়, কারণ তা অনবরত ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে চলেছে। 'যা নয়' এই দিয়েই চেতনার বা স্বাধীনতার পরিচয়। সেজন্যই সার্ত্র্‌ বলেছেন, "চেতনা হলো তাই যা তা নয়, এবং তাই নয় যা তা।"[৫]

সার্ত্র্‌-এর মতানুসারে, মানুষের মধ্যে সব সময়ই একটা অভাববোধ, অপূর্ণতা বা অতৃপ্তি রয়েছে। মানবিক অবস্থার একটা ট্রাজেডি হলো এই যে, মানুষ সব সময়ই কিছু না কিছু চায়। চাওয়ার ক্ষেত্রে এই যে বাকী থেকে যাওয়া, একেই সার্ত্র্‌ বলেছেন 'নাস্তিত্বের আর্তনাদ'। এই আর্তনাদের বিরাম নেই। চাওয়ার ক্ষেত্রে কোনদিনই মানুষের পরিপূর্ণ সন্তুষ্টিবিধান হয় না। এই অতৃপ্তিই প্রমাণ করে যে, মানুষ পূর্ণ নয়। চাওয়াটাই অভাব-বোধের সূচক। পূর্ণতার সংগে অভাববোধ বা অতৃপ্তি সামঞ্জস্যহীন। আমাদের সত্তা তাই অতৃপ্ত। নিত্য নতুন করে মানুষ নিজেকে সেজন্য অবিরত তৈরি করে চলেছে।

স্বাধীনতার নেতিবাচক বর্ণনা দেওয়া সার্ত্র্‌-এর পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। অস্বাভাবিক নয় এজন্য যে, সার্ত্র্‌ দেকার্তেরই উত্তরসাধক। দেকার্তও স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "কোন প্রকারে

৩. A. C. Danto, Sartre.
৪. W. S. Sahakian, Outline History of Philosophy.
৫. Sartre, Being and Nothingness.

যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা যায়, তাহলেই আমাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে আমরা 'না' বলতে পারি।" দেকার্তের বক্তব্য হলো, কোন কিছু 'না' বলার অধিকার আমাদের আছে। যা মিথ্যা তাকে বর্জন করার, যা সত্য নয় তাকে 'না' বলার স্বাধীনতা চেতনার আছে। দেকার্ত এভাবেই স্বাধীনতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন; অন্ততঃ সার্ত্র্ দেকার্তের ব্যাখ্যাকে এভাবেই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কিন্তু যুগ, পরিবেশ, ও অভিজ্ঞতা ভিন্ন হওয়ার ফলে সার্ত্র্ স্বাধীনতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন অন্যভাবে, অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে।

সার্ত্র্-এর স্বাধীনতার নেতিবাচক বর্ণনার উৎস দুটি,—দেকার্ত এবং হুসার্ল। কিন্তু সার্ত্র্ শুধুমাত্র একজন কার্তেজীয় সংশয়বাদী বা হুসার্লীয় মানসঘটনাবাদী নন। তিনি একজন অস্তিবাদীও। তাই তিনি স্বাধীনতার নেতিবাচক বর্ণনা দিয়েছেন অস্তিবাদের মূলতত্ত্ব 'অস্তিত্ব সারধর্মের পূর্ববর্তী'-র ওপর ভিত্তি করেই। তাঁর মতে, অস্তিত্বশীল হওয়ার অর্থ হলো স্বাধীনভাবে ও সক্রিয়ভাবে আমি কী হবো তা নির্বাচন করা। মানুষের স্বরূপ অনিয়ন্ত্রিত। প্রতি মুহূর্তে মানুষ নিজেকে নিজ দায়িত্বে তৈরি করে। সার্বিক •মানবপ্রকৃতি বলে কিছু নেই, কারণ "ঈশ্বর মৃত"। ঈশ্বরকে স্রষ্টা হিসেবে স্বীকার করলে তবেই এ কথা স্বীকার যায় যে, মানুষ সৃষ্টির আগে ঈশ্বরের মনে মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা ছিল। কিন্তু ঈশ্বর যেহেতু সার্ত্র্-এর দর্শনে অস্বীকৃত সেহেতু তাঁর কাছে সার্বিক মানব-প্রকৃতিও কিছু নেই। "স্বর্গ শূন্য" এবং আমরা আমাদের কর্মের দ্বারাই নিজেদের গড়ে তুলি। ব্যক্তি হিসেবে মানুষ অস্তিত্বশীল, শূন্য ও অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ, এবং তারপর সে কী হবে তা নিজ দায়িত্বে স্থির করে। অস্তিত্ব সারধর্মের পূর্ববর্তী—এই মূলতত্ত্বটির দ্বারা সার্ত্র্ ঐ কথাই বুঝিয়েছিলেন। সার্ত্র্ বলেছেন যে, ব্যক্তি যেমন স্বাধীনভাবে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেয়, তেমনিই নির্বাচন না করার সিদ্ধান্তও নেয়। নির্বাচন (বা স্থির) না করার সিদ্ধান্তও এক ধরনের নির্বাচন এবং তা স্বাধীনতাকেই সূচিত করে। এ থেকে মানুষের অব্যাহতি নেই। সার্ত্রের ভাষায়, "মানুষ সব কিছু থেকে মুক্ত হলেও স্বাধীনতা থেকে নয়।"[৬] এই "স্বাধীনতার জন্য সে দণ্ডিত।" স্বাধীনতার দাসত্ব থেকে মানুষের মুক্তি মেলে না। স্বাধীনতা ব্যক্তিসত্তার কোন গুণ নয়, তার সত্তারই অংশ। এমন কি, বলা চলে, স্বাধীনতাই তার সত্তা। প্রকৃতপক্ষে, সার্ত্র্ তাঁর 'এক্‌জিস্টেনসিয়েলিজম্ অ্যান্ড হিউম্যানিজম্' গ্রন্থে বলেছেন যে, "মানুষ স্বাধীন এবং স্বাধীনতাই মানুষ।"

৬. Sartre, Being and Nothingness.

সার্ত্‌র্‌ তাঁর সত্তা প্রসঙ্গ আলোচনায় বলেছেন যে, বস্তু-সত্তা স্বাধীন নয়, তার কোন কিছু হওয়ার ক্ষমতা নেই। বস্তু-সত্তার অভাববোধ নেই, তা পূর্ণ। মনুষ্যসত্তাই শুধু স্বাধীন। তার অভাববোধ আছে, অপূর্ণতা আছে, আর অপূর্ণতা আছে বলেই সে নিজের বর্তমান অবস্থাকে অতিক্রমণ করার চেষ্টা করে। সার্ত্‌র্‌-এর মতে, অতিক্রমণই স্বাধীনতার নামান্তর।

'বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস্‌' গ্রন্থে সার্ত্‌র্‌ বলেছেন যে, মানুষ কখনও দাস বা পরাধীন এবং কখনও স্বাধীন, এ হতে পারে না। সার্ত্‌র্‌ কাছে স্বাধীনতার অর্থ 'যা খুশি করার ইচ্ছা' নয়। সে জন্যই 'স্বাধীনতা হলো খামখেয়ালীপনা'—দস্তয়েভস্কির এই মত সার্ত্‌র্‌ গ্রহণ করতে পারেন নি। সার্ত্‌র্‌-এর কাছে স্বাধীনতার অথ 'নির্বাচনের স্ব-শাসন'। বস্তু সব সময়ই পূর্ণ, পর্যাপ্ত এবং মূল্যহীন; একমাত্র আমাদের স্বাধীন নির্বাচনের ও লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই বস্তুর মূল্যায়ন হয়। যেমন একটা পাহাড় নিজে মূল্যহীন, তাৎপর্যহীন। পায়ে হেঁটে দেশভ্রমণেচ্ছু ব্যক্তির কাছে পাহাড়টি বাধাস্বরূপ। অন্যদিকে, যিনি নির্জনে পারমার্থিক ধ্যানে মগ্ন থাকতে ইচ্ছুক, তাঁর কাছে পাহাড়টিই যথার্থ স্থান। আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার আলোকেই যে আমরা বস্তুর ওপর মূল্য ও অর্থ আরোপ করি, সার্ত্‌র্‌ স্বাধীনতার প্রাগুক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা তাই নির্দেশ করেছেন।

মানুষের স্বাধীনতা নিঃসন্দেহে তার পরিবেশ, দেহ, অসুস্থতা, বুদ্ধ্যঙ্ক (আই. কিউ.), মৃত্যু প্রভৃতি বহুবিধ উপাদানের দ্বারা সীমিত। তা সত্ত্বেও সার্ত্‌র্‌ মনে করেন যে, মানুষ, স্বাধীন, নিজ দায়িত্বে সে স্বাধীনভাবেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে, বা নির্বাচন করতে পারে। যেহেতু একটি খোঁড়া ছেলে অন্যান্য স্বাভাবিক খেলোয়াড়দের সংগে দৌড়ে জিততে পারবে না, সেহেতু এটা ধারণা করা স্বাভাবিক যে, খোঁড়া ছেলেটি স্বাধীন নয়। কিন্তু সার্ত্‌র্‌-এর মতে, খোঁড়া ছেলেটি স্বাধীন। স্বাধীন এই অর্থে, সে যখন বুঝতে পারে যে, তার পক্ষে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা অসম্ভব, তখন সে তার অক্ষমতাকে স্বীকার করে নিয়ে স্বাধীনভাবেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, সে প্রতিযোগিতায় নামবে না। সার্ত্‌র্‌ বলেছেন, "স্বাধীনতা মানব-প্রকৃতিতে নিহিত কোন আধিবিদ্যক শক্তি নয়, কিংবা যা খুশি করার ছাড়পত্র নয়, বা বন্দীদশায় মুক্তির কোন অনির্দিষ্ট বা অপরিচিত আশ্রয়স্থলও নয়। তবু আমরা স্বেচ্ছায় যা করি, আমরা বর্তমানে যা, তার জন্য আমরাই দায়ী—এই হলো রূঢ় বাস্তব ঘটনা।"[৭]

৭. **Sartre, The Age of Reason.**

সার্ত্রের কাছে মানুষ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমাত্র নয়। সমাজের সঙ্গে, জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত। মানুষ পরিবেশকে, যুগধর্মকে অস্বীকার করতে পারে না; তাকে কোন না কোন ভূমিকা পালন করতে হয়। ঐ ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তাকে কিছু কর্মও করতে হয়। কর্মেই মানুষের স্বাধীনতা প্রকাশ পায়। "স্বাধীনতা কোন জন্মগত গুণ নয়, যা আমাদের চূড়ান্ত বাধ্যতামূলক অবস্থা ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার ছাড়পত্র দেয়। সার্ত্‌র্‌-এর কাছে স্বাধীনতা বলতে বোঝায় কর্ম করার অঙ্গীকারের ক্ষমতা এবং কর্মের দ্বারা ভবিষ্যৎ রচনার সামর্থ্য।"[৮] সার্ত্‌র্‌-এর দর্শন তাই কর্ম ও সংহতির দর্শন, অঙ্গীকারের দর্শন। সার্ত্‌র্‌-এর মতে, আমরা প্রতি মুহূর্তে কোন না কোন পরিস্থিতি বা অবস্থার সম্মুখীন হই। স্বাধীনতা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে ঐ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই, যা অঙ্গীকার ও কর্মকে নির্দেশ করে।

সার্ত্‌র্‌-এর স্বাধীনতা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা যাতে অযথা সমালোচকদের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি না করে সে জন্য তিনি সজাগ ছিলেন। সার্ত্‌র্‌-এর দর্শনে 'স্বাধীনতা' শব্দটির পরিধি অনেক ব্যাপক এবং এর একটি গতিময় লক্ষণার্থ আছে। স্বাধীনতা একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা বা প্রক্রিয়া। আংশিকভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে স্বাধীনতা শূন্যগর্ভে পর্যবসিত হয়। অধ্যাপক জন লুইস্‌ সার্ত্‌র্‌-এর স্বাধীনতার ব্যাখ্যা প্রসংগে মন্তব্য করেছেন যে, অস্তিবাদে যে ধরনের স্বাধীনতার উল্লেখ রয়েছে তার কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এ ধরনের মন্তব্য বোধ হয় সঠিক নয়, কেননা, সার্ত্রের দর্শনে স্বাধীনতার ধারণা শূন্য ধারণা নয়, কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই স্বাধীনতা অর্থপূর্ণ হয়। স্বাধীনতা কারণের অস্বীকৃতিকে নির্দেশ করে না। কার্য-কারণতত্ত্ব সত্য, তবে নিয়ন্ত্রণবাদ অর্থে কারণের অস্তিত্ব সার্ত্‌র্‌ মানেন নি। তিনি বলেছেন, নিয়ন্ত্রণবাদ এবং অনিয়ন্ত্রণবাদের আলোকে সব কিছুকে ব্যাখ্যা করার পুরোনো অভ্যাস আমাদের ছাড়তে হবে।

'বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস্‌' গ্রন্থে সার্ত্‌র্‌ স্বাধীনতার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার মূল বক্তব্য হলো এই যে, স্ব-হেতু-সত্তার বা চেতনার অন্য নামই স্বাধীনতা। নঞীকরণের মধ্যেমেই স্ব-হেতু-সত্তার স্বাধীনতা প্রকাশ পায়। যা আছে তাকে অতিক্রম করে যা নেই সে সম্পর্কে অবহিত হওয়ার মধ্যেই স্বাধীনতার তাৎপর্য নিহিত। কিন্তু অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকেও সার্ত্‌র্‌ 'স্বাধীনতা'কে দেখেছেন। আমরা জানি, সার্ত্‌র্‌ সেই সময়ও ফ্রান্সে বাস করেছেন যখন সেই দেশ নাৎসীবাহিনীর অধিকারভুক্ত ছিল। জার্মান বন্দী-

৮. Sartre, Situations III.

শিবিরে অত্যাচারিত অবস্থায় ফরাসীরা যেভাবে বাস করেছেন সার্ত্র সেই অভিজ্ঞতায় ছিলেন অভিজ্ঞ। পরাধীন দেশের নাগরিক হয়ে বসবাস করার জন্য ফরাসীরা স্বাধীনতার আস্বাদ লাভে ছিলেন বঞ্চিত, অথচ স্বাধীনতার জন্য তাঁরা ছিলেন আকুল। সার্ত্‌র্‌ এঁদেরই একজন। তিনি সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন। পরাধীনতার জ্বালা ছিল তাঁর অন্তরের গভীরে; তাই মুক্তি কামনায় তিনি ছিলেন উন্মত্তপ্রায়। এ কথা সত্য যে, ফরাসী অস্তিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলন থেকে জন্ম নেয় নি। তবে রাজনৈতিক দিক থেকে অস্তিবাদী দর্শনের গুরুত্ব এবং তাৎপর্যের পেছনে নিঃসন্দেহে প্রতিরোধ আন্দোলনের অবদান রয়েছে, বিশেষ করে সেই সময়ের জীবনধারা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, অত্যাচার এবং প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুভয়। সার্ত্‌র্‌ বলেছেন, "জার্মান অধিকারভুক্ত থাকার সময়ই আমরা সবচেয়ে স্বাধীন ছিলাম …যতোই আমরা বাহ্যতঃ বেশী অত্যাচারিত হতাম, ততোই আমরা নিজেদের স্বাধীন ভাবতে পারতাম……। আমরা তখন সমস্ত অধিকার হারিয়েছি, এমন কি, কথা বলার অধিকারও আমাদের ছিল না। প্রতিদিনই আমরা অপমানিত হতাম, অকথ্য মানসিক অত্যাচার চলত সমানে, কিন্তু সবই সহ্য করতে হতো নীরবে। কোন অজুহাতে শ্রমিক, বা ইহুদী, রাজনৈতিক বন্দী-দের দলবদ্ধভাবে নির্বাসিত, এমন কি হত্যাও, করা হতো। প্রতিটি জায়গায় সংবাদপত্রে, বোর্ডে, পর্দায়—আমরা আমাদের নিস্প্রভ প্রাণহীন ছবি দেখতে পেতাম। ফরাসী জাতির এই ছবি আমরা যাতে মনেপ্রাণে গ্রহণ করি আমাদের অত্যাচারীরা তাই চাইত…।"[৯] এই সমস্ত কিছুর জন্যই আমরা ছিলাম স্বাধীন "যেহেতু নাৎসী অত্যাচারের বিষ-জর্জরিত ছবি আমাদের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখত, সেহেতু আমাদের প্রতিটি সঠিক চিন্তা ছিল এক একটি জয়ের প্রতীক। যেহেতু শক্তিমান পুলিশবাহিনী আমাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইত, সেহেতু আমাদের প্রতিটি কথা ছিল নীতির ঘোষণা স্বরূপ। যেহেতু হন্যে হয়ে আমাদের খোঁজা হতো, সেহেতু আমাদের প্রতিটি চলাফেরার গুরুত্ব ছিল অঙ্গীকারের মতো। ঐ পরিবেশ বা পরিস্থিতিই আমাদের অসম্ভব অস্তিত্ব (impossible existence) নিয়ে বাঁচাটাকে সম্ভব করে তুলেছিল……]। নির্বাসন, বন্দীদশা, এবং বিশেষ করে মৃত্যু আমাদের চিন্তার বিষয় ছিল। প্রতিমুহূর্তে আমরা 'মানুষ মরণশীল' এই সাধারণ প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থেই ছিলাম ভাবিত। মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আমরা প্রত্যেকে তখন নির্বাচন করেছি, সিদ্ধান্ত নিয়েছি বলেই তা ছিল সঠিক বা যথার্থ। 'না' বলার

৯, Sartre, Repeblic of Silunce.

স্বাধীনতা আমাদের ছিল।……শুধুমাত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের সক্রিয় অংশগ্রহণকারীরা নয়, সমস্ত ফরাসীরাই চার বছর ধরে দিনরাত 'না' বলার স্বাধীনতার আস্বাদন লাভ করেছে…। মুক্তি বা স্বাধীনতার মৌলিক প্রশ্নটি তখন আমাদের সামনে উপস্থাপিত ঃ 'যদি আমার ওপর অত্যাচার চলে, তা হলে আমি কি নীরব থাকতে পারব ?…… ।"[১০] আসলে, সার্ত্র্-এর স্বাধীনতার নৈতিবাচক বর্ণনার পটভূমি হলো ফরাসীদের ওপর নাৎসীবাহিনীর অত্যাচার ও দমন। সার্ত্র্ সেইজন্যই ঘোষণা করেছেন যে, 'না' বলার ক্ষমতা আমাদের সত্তার অচ্ছেদ্য অংগ এবং স্বাধীনতার সংগে আষ্টেপৃষ্টে জড়িত।

এটা এখন সুস্পষ্ট যে, সার্ত্র্ স্বাধীনতার সেই ধারণা অস্বীকার করেছেন যা শূন্যগর্ভ ও আকারগত (empty and formal)। তিনি বলেছেন, সব সময়ই একটি পরিস্থিতি বা অবস্থা থাকে যা আমাদের স্বাধীনতাকে সীমিত করে। এই অর্থে সার্ত্র্-এর স্বাধীনতার ধারণাকে 'সীমার মধ্যে স্বাধীনতা' (freedon within limits) অর্থেই বুঝতে হবে।

সার্ত্র্ তাঁর 'ক্রিটিক' গ্রন্থটিতে স্বাধীনতার ধারণার সংগে মার্কস্‌বাদের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছেন। সেখানে তিনি 'সম্ভাবনার ক্ষেত্র' (Field of possibilities) কথাটি ব্যবহার করেছেন এবং বলেছেন যে, স্বাধীনতা 'সম্ভাবনার ক্ষেত্রে'ই কার্যকরী। 'সম্ভাবনার ক্ষেত্র' বলতে বোঝায় সেই লক্ষ্য যেখানে পৌঁছানোর জন্য ব্যক্তি তাঁর বাস্তব পরিস্থিতি অতিক্রম করে যায়। সম্ভাবনার ক্ষেত্র ঐতিহাসিক এবং সামাজিক বাস্তবতার (historical and social reality) সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত। একে 'অনিয়ন্ত্রণের অঞ্চল' (Zone of indetermination) বলা উচিৎ নয়, বরং 'সুগঠিত অঞ্চল' (highly structured region) বলাই বাঞ্ছনীয়, যা সমগ্র ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। স্বাধীনতার মূল্য নিহিত আছে পরিস্থিতির স্বীকৃতিতে যা অঙ্গীকার ও কর্মকে সূচিত করে। এখানেই স্বাধীনতার হেঁয়ালী বা কূটাভাস নিহিত, কেননা, সার্ত্র্ বলেছেন, "পরিস্থিতি বা অবস্থাতেই স্বাধীনতা অর্থপূর্ণ, এবং স্বাধীনতার মাধ্যমেই অবস্থার সৃষ্টি হয়।"

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই শতকে স্বাধীনতার অন্যতম অতন্দ্র প্রহরী ছিলেন সার্ত্র্। রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে তাঁর অস্তিবাদ যে-স্বীকৃতি পেয়েছে তার মূলে আছে নাৎসী-অধিকৃত ফ্রান্স এবং সেখানে তৎকালীন অন্তরীণ ফরাসী জীবনধারা। প্রতিরোধ আন্দোলনকে যা তাৎপর্যময় করে তুলেছিল তা শুধুমাত্র প্রত্যেক অন্তরীণ কর্মীর (underground worker)

১০. Sartre, Republic of Silence.

গোপন এবং নাটকীয় নিঃসংগতা নয়, বরং এই অদৃশ্য সেনাবাহিনীতে নিঃসংগতার সংগে সংঘবদ্ধতার সমন্বয়। মানুষ স্বাধীন এবং তার স্বাধীনতার জন্য তাকে সংগ্রাম করতে হয়। এ কথার দ্বারা এটাও বোঝায় যে, তাকে অন্যদের স্বাধীনতার জন্যও সংগ্রাম করতে হয। তাঁর স্বাধীনতা যেমন অন্যদের স্বাধীনতার ওপর নির্ভরশীল, তেমনি অন্যান্যদের স্বাধীনতাও তার ওপর নির্ভরশীল, এই ঘটনা সার্ত্‌র্‌-এর অঙ্গীকারের মতবাদ(Theory of Commitment) কে সূচিত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ফ্রান্সে যে পরিস্থিতি ছিল তারই প্রত্যক্ষ পরিণতি হলো সার্ত্‌র্‌-এর অঙ্গীকারের মতবাদ। ফরাসীদের ওপর নাৎসী বাহিনীর ঘৃণ্য অত্যাচার ও পীড়নই তাদের (জার্মান নাৎসীবাহিনীর) বিরুদ্ধে ফরাসীদের ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছিল। ফলে, "স্বাধীনতা এবং সংঘবদ্ধতার মধ্যেই ছিল সমতা, সমস্ত সুযোগ-সুবিধার বিনাশ এবং সকল মানুষকে প্রলেতারিয়েত পর্যায়ে নিয়ে আসার প্রবণতা বা মানসিকতা। এটাই সার্ত্‌র্‌-কে জনগণেব সমস্যার প্রতি আগ্রহী এবং সাম্যবাদের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ করে তোলে"।[১১]

সার্ত্‌র্‌-এর মতানুসারে, মানুষ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমাত্র নয়, সমাজের সংগে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। নিজেকে আবিষ্কার করতে গিয়ে ব্যক্তি অন্যান্যদেরও আবিষ্কার করে—আবিষ্কার করে তার অস্তিত্বের শর্ত হিসেবে। ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, অন্যান্যরা ছাড়া তার কোন কিছু হওয়ার সুযোগ নেই, কেননা, অন্যান্যরাই তাকে সেই স্বীকৃতি দেয়। ব্যক্তির অস্তিত্বের জন্য এবং তার নিজের সম্পর্কে যে কোন জ্ঞানের জন্যই অন্যান্যরা অপরিহার্য। নিজেকে জানার মাধ্যমে ব্যক্তি এটাও জানতে পারে যে, অন্যান্যদের অস্তিত্বই স্বাধীনতা, এবং অন্যান্যরা ব্যক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে ছাড়া চিন্তা কিংবা ইচ্ছা করতে পারে না। এই জগতেই ব্যক্তিকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় সে কী এবং অন্যান্যরা কী। অস্তিবাদের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে তাই স্বাধীন অঙ্গীকার, যার দ্বারা প্রতিটি মানুষ এক ধরনের মানবিকতা এবং সাংস্কৃতিক প্যাটার্নের আপেক্ষিকতার ওপর এর প্রভাব উপলব্ধি করতে গিয়ে নিজেকেও উপলব্ধি করে। অঙ্গীকারই ব্যক্তিকে অন্যান্যদের স্বাধীনতা কামনায় উৎসাহী করে তোলে, যেমন করে তোলে নিজ স্বাধীনতা কামনায়। "আমার স্বাধীনতাকে আমি লক্ষ্য বস্তু করতে পারি না, যদি না অন্যান্যদের স্বাধীনতাকেও আমি আমার লক্ষ্যবস্তু করি"—সার্ত্‌র্‌-এর এই বক্তব্য তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতার কথাই আমাদের

১১. ১. P. Verma, Modern Political Theory, A Critical Survey.

স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যানাদের অস্তিত্ব ছাড়া ব্যক্তির নিজের অস্তিত্বের কোন গুরুত্ব নেই,—গুরুত্ব নেই এজন্য যে, একা কোন ব্যক্তি কখনই অস্তিত্বশীল হয়ে বাঁচতে পারে না। অন্যের অস্তিত্ব স্বীকার না করে, অথবা অন্যের সম্পর্কে অবহিত না হয়ে আমি অস্তিত্বশীল হতেই পারব না। আর পাঁচজনকে নিয়েই আমি সমাজে, জগতে অস্তিত্বশীল। বস্তুত, সার্ত্র্ বলেছেন, " 'অস্তিত্ব' শব্দটির চরিত্রই সামাজিক।"

সার্ত্র-এর দর্শনের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, তাঁর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের ধীরে ধীরে উত্তরণ ঘটছে সমাজতন্ত্রে। তাঁর চলার ইতিহাস হলো ধীরে ধীরে 'ব্যক্তি'কে ছেড়ে 'গোষ্ঠী'র ওপর মনোযোগ নিবন্ধ করার প্রচেষ্টা। ব্যক্তি ঐ গোষ্ঠীরই সদস্য। কেন্দ্রবিন্দু ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতায় যে সরে এসেছে তা সার্ত্র্-এর চিন্তা-ধারার বিকাশ লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। সার্ত্র্-এর মতানুসারে, অস্তিবাদ জন্ম নিয়েছিল শিল্প-সমাজের অবস্থায়। কিন্তু তার অগ্রগতি থমকে দাঁড়িয়েছিল মার্কস্‌বাদের অগ্রগতির ফলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অস্তিবাদের পুনরাবির্ভাব ঘটে। এই পুনরাবির্ভাবের কারণ নিহিত আছে তাঁর মতবাদ এবং মার্কসীয় মতবাদের মধ্যে এক ফারাক-এ। মার্কসীয় মতবাদ অনুসারে, পরিস্থিতিই মানুষকে গড়ে তোলে। অপরপক্ষে, সার্ত্র্-এর মত হলো, মানুষ নিজেই নিজেকে গড়ে তোলে, অবশ্য পরিস্থিতিকে অস্বীকার করে নয়। সার্ত্র্ যেহেতু মার্কস্‌বাদ এবং অস্তিবাদ উভয়েরই সমর্থক, তাই তাঁকে এক বিশেষ ধরনের সমাজতন্ত্রের সমর্থক হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি ছিলেন ব্যক্তি স্বাধীনতার এবং সামাজিক কল্যাণের আদর্শে বিশ্বাসী। ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল্যকে বিনষ্ট না করে সমাজতন্ত্র যাতে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। আর, বস্তুত সেই উদ্দেশ্যেই তিনি রচনা করেছেন তাঁর 'ক্রিটিক' গ্রন্থটি। সেখানে তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে আপসহীন সংগ্রামী এবং সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ব্যক্তিকে সমাজে স্বাধীন জীবন প্রতিষ্ঠায় কৃতসংকল্প।

মার্কস্‌বাদকে সার্ত্র্ 'বিশশতকের শ্রেষ্ঠ দর্শন' হিসেবে অভিহিত করেছেন। মার্কসের প্রভাবে তিনি ছিলেন প্রভাবিত। মার্কসের মতো সার্ত্র্ও বিশ্বাস করতেন যে, জগৎটাকে ব্যাখ্যা করাই আসল কাজ নয়, কর্মের সাহায্যে তাকে পাল্টাতে হবে। স্বাধীন কর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় তাঁর বিশ্বাস ছিল অবিচল। স্বাধীনতার একনিষ্ঠ পূজারী সার্ত্র্ যে কোন মূল্যে মানুষের স্বাধীনতা রক্ষায় ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী। নিজের জীবন বিপন্ন করেও মুক্তি সংগ্রামের নায়ক সার্ত্র্ বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা

আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন। ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে তাঁর আজীবন আপোসহীন সংগ্রামের কথা সর্বিদিত।

মার্কস্ সমাজ-রূপান্তরের কর্মকাণ্ডের যে নাম দিয়েছিলেন 'প্রাক্সিস্', সার্ত্‌র্ তাঁর 'ক্রিটিক' গ্রন্থে বারবারই সেই প্রাক্সিসের কথা বলেছেন। তাঁর মতে প্রাক্সিস্ হলো মানবিক কর্ম। এই মানবিক কর্মের দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশটি হলো একটি বিষয়ীগত পরিকল্পনা (a project) যা ব্যক্তি গঠন করে, আর দ্বিতীয় অংশটি হলো বিষয়গত বাস্তব পরিস্থিতি যা সে পাল্টাতে চায়। না-চাওয়া বর্তমানের বাস্তব পরিস্থিতির অতিক্রমণের প্রচেষ্টাই প্রাক্সিসের সারকথা। কিন্তু অভিপ্রায় ছাড়া না-চাওয়া বর্তমান পরিস্থিতি অতিক্রমণের মানবিক প্রচেষ্টাকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। সার্ত্‌র্-এর মতানুসারে, এই প্রাক্সিস্ সদাই দ্বান্দ্বিক, কেননা, পরিকল্পনা এবং বাস্তব ঘটনার সংঘর্ষই দ্বান্দ্বিকতা।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁর 'ক্রিটিক' গ্রন্থে সার্ত্‌র্ যেভাবে স্বাধীনতাকে ব্যাখ্যা করেছেন তাই মার্কস্‌বাদ ও অস্তিবাদের মধ্যে তাঁর সমন্বয়ের প্রচেষ্টার প্রাণস্বরূপ। সমাজকেন্দ্রিক মার্কসীয় কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতার স্থান নির্ণয় করাই অস্তিবাদী মার্কস্‌বাদের মূল লক্ষ্য। মার্কস্‌বাদ্‌কে তিনি এভাবেই 'পূর্ণায়িত' করতে চেয়েছেন। উইলফ্রেড্ দেসান তাঁর 'দ্য মার্কসিজম্ অব্ জাঁ-পল সার্ত্‌র্' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, "কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও সার্ত্‌র্-এর 'ক্রিটিক' গ্রন্থটি অনবদ্য, এবং স্বাধীনতার সপক্ষে এক সোচ্চার কণ্ঠ।" প্রসংগত উল্লেখ করা যায় যে, সার্ত্‌র্ বুর্জোয়া সমাজ-চিন্তার মুখ্য লক্ষ্য আত্মার স্বশাসন (autonomy of Self)-কে বর্জন করেছেন এবং সগর্বে ঘোষণা করেছেন যে, কেবলমাত্র কোন গোষ্ঠীতেই স্বাধীনতা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই স্বাধীনতার জন্যই সার্ত্‌র্ চেয়েছিলেন একটি গণতান্ত্রিক গোষ্ঠী, প্রচার করেছিলেন সমষ্টিগত দায়িত্বের মতবাদ। বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে বর্জন করে সার্ত্‌র্ গ্রহণ করেছিলেন সমাজতন্ত্রকে। তাঁর মতে, শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হবে এবং তা সম্ভব সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়েই। তবে, এটাও দেখতে হবে, সমাজতন্ত্রের নিয়ম-নিষ্ঠার চাপে যেন ব্যক্তি ও তার ব্যক্তিত্ব পিষ্ট না হয়। বস্তুত এই দৃষ্টিভংগী থেকেই গড়ে উঠেছে সার্ত্‌র্-এর বিতর্কিত দার্শনিক গ্রন্থ 'দ্য ক্রিটিক অব্ ডায়েলেকটিক্যাল রীজন।'

সার্ত্‌র্-এর 'ডায়েলেকটিক্' বা দ্বান্দ্বিকতা মানুষ বা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ নয়। ব্যক্তির স্বাধীন কর্মই এর প্রত্যক্ষ উৎসস্থল। মানুষের বাইরে এবং মানুষ ছাড়া দ্বান্দ্বিকতা সার্ত্‌র্-এর কাছে একটি প্রকল্পমাত্র (mere hypothesis)। ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিকতার সমগ্র কাঠামোটাই বস্তুত ব্যক্তিক কর্মকান্ড বা প্রাক্সিসের ওপর নির্ভরশীল, কারণ, তা নিজেই দ্বান্দ্বিক।

সার্ত্র্ঃ রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্

একজন দায়িত্বশীল লেখক হিসেবে সার্ত্র্ লিখেছেন বিস্তর—নানা জাতের, নানা স্বাদের। তাঁর রাজনৈতিক লেখাগুলি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ও গুরুত্বপূর্ণ। শুধু তাই নয়, প্রাসংগিকও বটে। কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ তৈরির অহংকারের দ্বারা চালিত না হয়ে সার্ত্র্ সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে তাঁর চারপাশের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করেছেন, মতামত প্রকাশ করেছেন নির্ভীকভাবে, মানুষের হয়ে বিশ্বদরবারে তাঁর প্রতিক্রিয়া পৌঁছে দিয়েছেন।

সার্ত্র্-এর রাজনৈতিক লেখাগুলি এক ধরনের সাংবাদিকতা। তবে, তাঁর সাংবাদিকতার চরিত্র সাধারণ সাংবাদিকতার মতো নয়। ঘটনা সমূহের বর্ণনায় তাঁর সাংবাদিকতা সীমাবদ্ধ নয়। তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য, অত্যুজ্জ্বল মেধা এবং তীক্ষ্ণ বিচারশক্তির প্রয়োগে প্রতিটি রচনাকেই করে তুলেছেন মনোগ্রাহী, তথ্যমূলক, গভীর বিষয়-সমৃদ্ধ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বের সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কেই তিনি ছিলেন আগ্রহী। বিশ্বের যে কোন প্রান্তে যখনই ঘটেছে কোন অবিচার, পীড়ন এবং অন্যায় তখনই শোনা গেছে তাঁর প্রতিবাদমুখর কণ্ঠ।

সার্ত্র্-এর সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের ইতিহাস বড়োই বিচিত্র। আমরা দেখেছি, শুরু করেছিলেন তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতার একজন কট্টর প্রবক্তা হিসেবে। পরবর্তী-

কালে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই তাঁকে শিখিয়েছিল যে, ব্যক্তি তাঁর স্বাধীনতা লাভ করতে পারে একমাত্র সমাজের মাধ্যমেই, সমাজের একজন হয়ে—যদিও ব্যক্তি তার নিজ প্রাক্সিসের ভিত্তিতে সেই সমাজকে বদলাতে শুরু করে। বস্তুত, সার্ত্র্‌-এর রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিবর্তন ব্যক্তিক নিঃসঙ্গতা বা একাকিত্ব থেকে সামাজিক গোষ্ঠী গঠনের দিকে যাত্রা। সেই যাত্রার কাহিনী ছড়িয়ে আছে তার গল্পে, নাটকে, উপন্যাসে ও দর্শনে।

সার্ত্র্‌-এর দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা এবং কর্মকাণ্ড বিশ্বের নানামহলে নানাভাবে সমালোচিত হলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, তিনি সারাজীবন নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের প্রতি নৈকট্য অনুভব করেছেন, তাদের সমর্থনে কথা বলেছেন এবং চেষ্টা করেছেন তাদের জীবন-সংগ্রামের অংশীদার হতে। পুঁজিবাদীদের প্রতি তিনি প্রকাশ করেছেন অবিশ্বাস ও ঘৃণা আর শ্রমজীবী মানুষের প্রতি প্রকাশ করেছেন সহানুভূতি ও প্রীতি-ভালোবাস। শ্রমজীবী মানুষের অগ্রগতি সম্পর্কে পোষণ করেছেন সুগভীর আকাঙ্ক্ষা, এবং দৃঢ়বিশ্বাস। এই মানসিকতাই সার্ত্র্‌-কে সহানুভূতিশীল করে তুলেছে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া ও সাম্যবাদী আন্দোলন সম্পর্কে। মার্কস্‌বাদ সম্পর্কে ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে তিনি সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন যে, 'আমাদের যুগে মার্কস্‌বাদ হলো শ্রেষ্ঠ দর্শন ; এ হলো এমন একটি দর্শন যার বাইরে আমরা যেতে পারি না, এবং অস্তিবাদ হলো এরই অধীনস্থ একটি মতাদর্শ।'[১]

সার্ত্র্‌-এর রাজনৈতিক জীবনচর্চা ও চর্যা সাহস, সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় বহন করে—এ বিষয়ে সম্ভবত কোন দ্বিমত নেই। রাজনৈতিক দিক থেকে তিনি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বা ঘটনার ক্ষেত্রে বরাবরই পক্ষ অবলম্বন করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না। প্রাণনাশের হুমকিও তাঁকে নিরস্ত করতে পারে নি। জীবনের প্রথমদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদী হলেও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ এবং যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বাস্তবের অভিজ্ঞতা এবং পরিস্থিতির চাপ তাঁকে টেনে নিয়ে এলো সমাজ ও রাজনীতির জটিল আবর্তে। যুদ্ধের ঠিক আগে ১৯৩৮-এ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নসিয়া' প্রকাশিত হয়। নায়কের রোজনামচার আকারে লিখিত ঐ উপন্যাসে নায়ক অসংগত, অপ্রীতিকর, বিশৃংখল ও যন্ত্রণাময় জগতের ঘটনা প্রবাহে দিশেহারা, বিবমিষায় আক্রান্ত। শৃংখলাহীন জীবনস্রোতে শেষ পর্যন্ত নায়ক শিল্পের জগতে মানুষের মুক্তির সন্ধান পায়। এখানে আমরা নায়কের আড়ালে তাঁর

১. **Sartre, The Problem of Method, Preface.**

স্রষ্টা সার্ত্র্‌-কেই খুঁজে পাই। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সার্ত্র্‌ শিল্পের কল্পলোক থেকে, ভাবালুতার পরিবেশ থেকে, বেরিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন 'বাস্তব' মাটির পৃথিবীতে।

'নসিয়া'-র পর সার্ত্র্‌ লিখেছেন আরো একটি উপন্যাস। নাম 'রোডস্‌ টু ফ্রিডম্‌'। তিন খণ্ডে রচিত ঐ উপন্যাসের প্রথম খণ্ড 'দ্য এজ অব্‌ রীজন'-এ নায়ক মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় মোহ থেকে মোহান্তরে ছুটে বেরিয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ড 'দ্য রিপ্রীভ'-এ আমরা পাই প্রাক্‌-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপে রাজনৈতিক সংকটের চিত্র। আর তৃতীয় খণ্ড 'আয়রন ইন্‌ দ্য সোল'-এ রয়েছে মহাযুদ্ধের পর্বে ফ্রান্সের বিধ্বস্ত পরিবেশ ও পতন। মোহগ্রস্ত, বিভ্রান্ত ভাবালু নায়ক যুদ্ধের বাস্তবতা এবং রাজনীতির চাপে এই রূঢ় বাস্তব জগতে জীবনের আদর্শ খুঁজে পেয়েছে পতিত ফ্রান্সের মুক্তিযুদ্ধের এক সৈনিকের ভূমিকায়। এ যেন সার্ত্র্‌-এর-ই জীবনচরিত। আমরা জানি জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সে সার্ত্র্‌-এর বন্দীদশার কথা, কিছুকাল পর মুক্তি এবং তারপর গোপনে জার্মান ফ্যাসীবাদবিরোধী মুক্তিযুদ্ধে কম্যুনিষ্টদের সহযোগী হিসাবে অংশগ্রহণের কথা। যুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তীকালে সার্ত্র্‌ যে-সব গল্প নাটক লিখেছেন, যেমন, দ্য ওয়াল, দ্য ফ্লাইজ, নো এক্‌জিট, ক্রাইম প্যাসোনেল, লুসিফার অ্যাণ্ড দ্য লর্ড, ডার্টি হ্যাণ্ডস্‌, নেক্রাসভ, দ্য কন্‌ডেমড্‌ অব্‌ অ্যালটোনা, দ্য রেসপেক্টবল্‌ প্রস্টিটিউট প্রভৃতি, সেখানেও আমরা দেখি বাস্তব অসংগত জগতে রাজনীতির আবর্ত, সাহিত্য-শিল্পের জগৎ থেকে বেরিয়ে মাটির পৃথিবীর মানুষের কাছাকাছি চলে আসার আন্তরিক প্রয়াস। বস্তুত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড অভিঘাতই সার্ত্র্‌-কে রাজনীতি সচেতন করে তোলে। বন্ধু পল নিঁজ-র বক্তব্য "রাজনীতি থেকে সরে থাকাও এক ধরনের রাজনৈতিক মনোভাব" সেজন্যই সার্ত্র্‌-এর স্বীকৃতি পেয়েছিল।

যুদ্ধের শেষ পর্বে ১৯৪৫-এ সার্ত্র্‌ প্রকাশ করেন 'এক্‌জিস্টেনসিয়েলিজম্‌ অ্যাণ্ড হিউম্যানিজম্‌' গ্রন্থটি। প্রবন্ধকারে লিখিত ঐ গ্রন্থটিতে সার্ত্র্‌ অস্তিবাদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সংগে। তাঁর মতানুসারে, অস্তিবাদের মূল বক্তব্য হলো এই যে, সবচেয়ে জটিল পরিস্থিতিতেও মানুষ স্বাধীন ; মানুষের দায়িত্ব অপরিসীম, কেননা, সে যা হয় তা তার মনোনয়নের ফল। সার্ত্র্‌-এর অস্তিবাদের বিরুদ্ধে কম্যুনিস্টদের কিছু বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও জর্জ লুকাক্স-এর মতো কম্যুনিস্ট বুদ্ধিজীবী সার্ত্র্‌-এর অস্তিবাদকে বাতিল করে দেন নি। বরং তিনি সার্ত্র্‌-এর গুণকীর্তন করে 'ইতিহাস ও শ্রেণীচেতনা' গ্রন্থে বলেছেন যে, সার্ত্র্‌-এর স্বাধীনতার প্রত্যয়

বা ধারণা এবং ব্যক্তির মনোনয়নের গুরুত্বকে বুর্জোয়া নিয়ন্ত্রণবাদ এবং ভাল্‌গার মার্কস্‌বাদ প্রায়শই ছোট করে দেখে। অথচ সমস্ত সামাজিক ক্রিয়া ব্যক্তিক ক্রিয়াসমূহের দ্বারা গঠিত এবং বাস্তব উপাদানের (material conditions) গুরুত্ব যতই হোক্‌ না কেন, এঙ্গেল্‌স্‌ বলেছেন, তা 'শেষ স্তরে' উপলব্ধ হয়।

এরও আগে ১৯৪৩-এ সার্ত্‌র্‌ প্রকাশ করেছিলেন 'বিয়িং অ্যাণ্ড নাথিংনেস্‌' গ্রন্থটি। এটাই অস্তিবাদ সম্পর্কে সার্ত্‌র্‌-এর মৌলিক গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থে তিনি স্বাধীনতার ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে। ইউরোপের পক্ষে ঐ সময়টা ছিল খুবই দুর্দিনের। দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসকাণ্ড ইতোমধ্যেই তার কালো ছায়া বিস্তার করেছে। ফ্যাসীবাদ গণতন্ত্রের শ্বাস রুদ্ধ করেছে। মানুষ বিজ্ঞান ও নৈতিকতার সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টায় আস্থা হারিয়েছে। শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টায় এবং মানবজীবনের স্বাধীনতায় বিশ্বাস হারিয়ে মানুষ হতাশায় ভুগছে। সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, ব্যক্তি মানুষই তার ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে। স্বাধীনতার আশা লুপ্ত প্রায় এবং এক ধরনের নৈরাশ্য মানুষকে গ্রাস করছিল। জার্মান নাৎসীবাহিনীর দলবদ্ধ অত্যাচারে ফ্রান্স যখন ধুঁকছিল, তখনই সার্ত্‌র্‌ লিখেছেন, "মানবিক স্বাধীনতা সারধর্মের পূর্ববর্তী এবং স্বাধীনতাই তা সম্ভব করে তোলে। মানবিক সত্তার সারধর্ম তার স্বাধীনতায় বিধৃত। এটা সত্য নয় যে, মানুষ প্রথমে অস্তিত্বশীল এবং তারপর সে স্বাধীন হয়; মানুষের সত্তা এবং তার স্বাধীন হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই…।"[২] স্বাধীনতা ব্যক্তিসত্তার কোন গুণ নয়, তার সত্তারই অংশ; এমনকি, বলা চলে যে, স্বাধীনতাই তার সত্তা। বস্তুত সার্ত্‌র্‌ বলেছেন যে, মানুষ স্বাধীন এবং স্বাধীনতাই মানুষ। এই স্বাধীনতা মুষ্টিমেয় লোকের সম্পত্তি নয়; প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি মুহূর্তের অস্তিত্বের সংগে স্বাধীনতা জড়িয়ে আছে। 'বিয়িং অ্যাণ্ড নাথিংনেস্‌' গ্রন্থের নানা জায়গায় সার্ত্‌র্‌ উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে প্রতিটি ব্যক্তি কীভাবে তার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে নিজ স্বাধীনতাকে প্রয়োগ করেছে।

সার্ত্‌র্‌ ঐ গ্রন্থে সত্তা এবং শূন্যতা, স্ব-স্থিত সত্তা (Being-in-itself) এবং স্ব-হেতু সত্তার (Being-for-itself) মধ্যে পার্থক্য করে বলেছেন, স্ব-স্থিত সত্তা হলো জড়াত্মক সত্তা এবং আমরা এই জড়াত্মক সত্তা বা বস্তুকেই জানি।

২. **Sartre, Being and Nothingness.**

স্ব-স্থিত সত্তার বর্ণনা প্রসংগে তিনি বলেছেন, "এই সত্তা হলো অচেতন, নিষ্ক্রিয়, স্থির বা অচঞ্চল, বাস্তব, ভারবিশিষ্ট, পূর্ণ এবং সমস্ত রকম সম্ভাবনা-রহিত। স্ব-স্থিত সত্তা শুধুমাত্র আছে,—ব্যস্ এই পর্যন্তই। অন্য কিছু হওয়ার সম্ভাবনা এর নেই। 'যা আছে তাই'—এ ভাবেই স্ব-স্থিত সত্তা সম্পর্কে উক্তি করা চলে। যেমন, একটি কলমদান সবসময়ই কলমদান, অন্য কিছু হওয়ার সম্ভাবনা এর নেই···।"[৩] অপরপক্ষে, স্ব-হেতু সত্তা স্ব-স্থিত সত্তার বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। অসম্পূর্ণতা, অভাববোধ, সম্ভাবনা, অনির্দিষ্ট কাঠামো—এ সবই হলো স্ব-হেতু সত্তার বৈশিষ্ট্য। স্ব-হেতু সত্তা সম্পর্কে সার্ত্র্ বলেছেন, "এই সত্তা সব সময়ই গতিশীল, পরিবর্তনের আধার, এবং প্রতি মুহূর্তেই অতৃপ্ত ও অপূর্ণ। স্ব-হেতু সত্তা 'এখন যা' তা থেকে 'এখনও যা নয়' তা হতে পারে···।"[৪] চেতনা সব সময়ই কোন কিছুর চেতনা, সব সময়ই কোন বিষয় অভিমুখী। চেতনা সব সময়ই যা তা নয় সেদিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে। সার্ত্র্ বলেছেন, "যা সে নয় সেদিকেই চেতনায় যাত্রা—তার মধ্যে রয়েছে এক অপূর্ণতা বা অভাব-বোধ (lack)।"[৫] মানুষ (স্ব-হেতু সত্তা) অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ, এবং জগতের সংগে মূর্ত বিশেষ সম্পর্ক থেকে সে সৃষ্টি করে মূল্য বা মান (Values)। সার্ত্র্-এর মতে, "আমার স্বাধীনতা মূল্যের অনুপম ভিত্তি,···এবং কোন বিশেষ মূল্য গ্রহণে আমাকে শূন্যতাই (Nothing) সমর্থন করে,···মূল্যের ভিত্তি হওয়ার জন্য আমার স্বাধীনতার রয়েছে নিদারুণ মনস্তাপ (anguish), অথচ আমার স্বাধীনতা নিজে ভিত্তিহীন।"[৬] মনস্তাপ এবং উদ্বেগের অনুভূতিতেই এ ধরনের স্বাধীনতার উপলব্ধি আমাদের হয়। সার্ত্র্ মনে করেন না (অন্তত 'বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস্ গ্রন্থে) যে, এই স্বাধীনতা, এই উদ্বেগের পরিস্থিতি, বিশেষ সামাজিক এবং ঐতিহাসিক অবস্থার ফল। তাঁর মতে, উদ্বেগ-বিদীর্ণ স্বাধীনতা প্রতিটি যুগের মানসিক অবস্থার স্বাভাবিক ও সার্বিক দিক। উদ্বেগ সম্পর্কে সার্ত্র্-এর ধারণা তাঁকে এই সত্যে পৌঁছে দিয়েছিল যে, মানবিক স্বাধীনতা প্রাত্যহিক অত্যাচার ও হত্যা, ঔপনিবেশিক যুদ্ধ এবং নাৎসী অত্যাচারের বর্বরতার দ্বারা পীড়িত। পরবর্তী সময়ে সার্ত্র্ তাঁর অভিজ্ঞতার ফলে স্বীকার করেছেন যে, "মানুষের অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে সে স্বাধীনভাবে ক্রিয়া

৩. **Sartre, Being and Nothingness.**
৪. ঐ
৫. ঐ
৬. ঐ

করে থাকে, বস্তুত তার সামাজিক শ্রেণীর (social class) নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা।"[৭] মার্ক পোস্টার বলেছেন, "অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রমিথিয়ান ঐতিহ্য (promethean tradition) এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শ সাম্যবাদী (utopian Commumist) —এই দুয়ের মাঝখানে সার্ত্র্ একটি 'তৃতীয় পথ' আবিষ্কারের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তিনি মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রক্ষায় ছিলেন উদ্যোগী, এবং অগ্রসরমান প্রযুক্তির মধ্যে যে সম্ভাবনা রয়েছে তার দরজা খোলা রেখেছেন, যা মানবিক পরিরিস্থিতির অসুখকর বিরোধসমূহকে উপেক্ষা করবে না বা এড়িয়ে যাবে না।"[৮] মানবিক স্বাধীনতার প্রমিথিয়ান আদর্শের ধারণার বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন সার্ত্র্ এবং আবিষ্কার করেছেন পাস্কালীয় অসংগতিকে। তাঁর মতে, মানুষ উদ্বেগের বোঝা সহ্য করতে পারে না, অথচ উদ্বেগের মধ্যেই তাকে স্বাধীনভাবে কর্ম করতে হয়। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে তার স্বাধীনতাকে চেপে রেখে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চায়। এই মনোভাবকে সার্ত্র্ বলেছেন 'মন্দ বিশ্বাস (Bad faith), যেখানে স্ব-হেতু সত্তা যথার্থ অস্তিত্বশীল হতে 'ব্যর্থ হয়। এ হলো এক ধরনের চ্যুতি যেখানে মানুষ নিজেকে জড়বস্তুতে পরিণত করতে চায়। কিন্তু 'মন্দ বিশ্বাস'-এর অবস্থাতেও এক ধরনের মনোনয়ন থাকে (যদিও খানিকটা বিকৃত), কেননা, মানুষ পুরোপুরি বস্তুতে কখনও পরিণত হয় না।

'মন্দবিশ্বাস'-এর ধারণার আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য সার্ত্র্ যথার্থ স্বাধীনতার আদর্শে পৌঁছোতে পারেন নি, যেখানে ব্যক্তি অন্যান্যদের সহযোগিতায় কোন এক পরিস্থিতিতে তার নিজ অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৮—এই সময়ের পরিধিতে সার্ত্র্ উপলব্ধি করেছেন পরিস্থিতি ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা। সেজন্য তিনি 'বিট্উইন-এক্জিস্টেনসিয়েলিজম্ অ্যান্ড মার্কসিজম্' গ্রন্থে বলেছেন, "জীবন আমাকে শিখিয়েছে পরিস্থিতির ক্ষমতা বা শক্তির কথা।" তাই সার্ত্র্ তাঁর চিন্তাধারার অন্তর্ভুক্ত করেছেন পরিস্থিতিকে, যাকে তিনি 'বিষয়গত সম্ভাবনা' বলে অভিহিত করেছেন। সার্ত্র্ ক্রমশই বুঝতে পারছিলেন যে বিষয়গত উপাদান আমাদের মনোনয়নের শর্ত, এবং মূর্ত স্বাধীনতা-দায়িত্ব সম্পর্কিত কোন মতবাদে অবশ্যই এগুলির উল্লেখ থাকবে। পরিস্থিতিকে

৭. **Sartre, What is Literature ?**

৮. **Mark Poster, Existential Marxism in Post-war France.**

মেনে নিয়ে তাই সার্ত্র্-কে বলতে শোনা যায়, মানুষ সব সময়ই কোন না কোন পরিস্থিতিতে থাকে, যদিও সেই পরিস্থিতি রূঢ় বাস্তব এবং মানবিক ক্রিয়ার যৌথ ফল। মানুষের শেকড় রয়েছে জগতের মধ্যেই এবং স্বাধীনতা কেবলমাত্র জাগতিক পরিস্থিতিতেই সম্ভব। মানবিক স্বাধীনতা জাগতিক পরিস্থিতিতেই অন্যান্যদের সংগে সম্পর্কিত হয়ে ক্রিয়া করে। তবে, সার্ত্র্ মনে করতেন যে, বিষয়গত অবস্থা বা পরিস্থিতি ছাড়া মানবিক স্বাধীনতা ক্রিয়া করতে পারেনা সত্য, কিন্তু অবস্থা বা পরিস্থিতি মানুষকে কোন বিশেষ কর্মপদ্ধতির জন্য তৈরি করতে পারে, মানুষ কী করবে তা নির্ধারণ করতে পারে না। মানুষ এবং জগতের সীমিত পরিস্থিতিতে ক্রিয়া করলেও মানবিক স্বাধীনতা সীমাহীন, কেননা, মানুষ তার পরিস্থিতি ও জগৎকে সবসময়ই পরিবর্তিত করতে পারে।

১৯৪৫-খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্ বন্ধুবান্ধবদের সংগে নিয়ে 'লে তঁ মদার্ন' নামক একটি সমাজতন্ত্রধর্মী মাসিক পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন। পত্রিকাটি ছিল রাজনৈতিক দলের সংগে সম্পর্কহীন বামপন্থী চিন্তাধারার এক স্বাধীন মুখপত্র। এই পত্রিকাতেই সার্ত্র্-এর সামাজিক এবং রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার ফসল প্রকাশিত হতে থাকে। ঐ বছরই 'কঁবা' এবং 'ল্য ফিগারো' পত্রিকার প্রতিনিধি হিসাবে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, ব্রতোঁ, আঁদ্রে মাসোঁ, লেভি স্ত্রাউস প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌দের সংগে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। ১৯৪৮-এ আমরা দেখি সার্ত্র্ ক্রমবর্ধমান ঠাণ্ডা লড়াই মেরুকরণের (cold war polarisation) পরিপ্রেক্ষিতে একটি 'তৃতীয় পথের' সন্ধানে ব্যগ্র। ঐ বছরই তিনি 'ল্য রাসাঁবলমাঁ দেমোক্রাতিক রেভল্যুসিয়নের' (The Rassemblement Democratique Revolution-naire) বা 'গণতান্ত্রিক বৈপ্লবিক সম্মেলন' নামক সংগঠনে যোগদান করেন। বুদ্ধিজীবীদের এই সংস্থা ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য বামপন্থীদের 'মধ্যে মধ্যস্থতার জন্য সচেষ্ট ছিল। ১৯৪৮ পর্যন্ত সার্ত্র্-এর যাত্রাপথ একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, সার্ত্র্ ধীরে ধীরে 'গোষ্ঠী'র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছিলেন এবং ঐ সংগে মানব মুক্তির সংগ্রামের জন্য আন্তর্ব্যক্তিক ক্রিয়াকলাপ যে অপরিহার্য তা অনুভব করেছিলেন। জড়বাদ সার্ত্র্-কে সন্তুষ্ট করতে পারে নি, কেননা, তা মানুষের স্বাধীনতাকে রক্ষা করে না। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে 'মেটেরিয়ালিজম্ অ্যাণ্ড রেভল্যুশন' প্রবন্ধে তিনি বস্তুত জড়বাদকে খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন। "তিনি আগ্রহী ছিলেন এমন একটি 'গোষ্ঠী' গঠন করতে যেখানে

সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে 'আলোচনা'র ভিত্তিতে এবং যেখানে প্রত্যেকেই অনুভব করবে যে, তার স্বাধীনতা মর্যাদা সহকারে সুরক্ষিত।"[৯] ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্‌র্‌ রাজনৈতিক ক্রিয়ার (Political action) জন্যই দাভিদ রুসে ও জেরার-রোজাঁতাল-এর সংগে প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হিসেবে যোগদান করেন গণতান্ত্রিক বৈপ্লবিক সম্মেলন নামক সংস্থায়। সংস্থার নানা কাজকর্মের মধ্যে ছিল পুঁজিবাদের সামাজিক কাঠামো ও বুর্জোয়া মতাদর্শকে ধ্বংস করা, বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা চক্র ও বিতর্ক সভার ব্যবস্থা করা, এবং পুঁজিবাদী সংস্কৃতিকে নতুন বৈপ্লবিক সংস্কৃতির দ্বারা পরাজিত করা। এ ভাবেই ১৯৪৮-এ রাজনৈতিক জগতে সার্ত্‌র্‌ প্রবেশ করলেন এক বিরাট আশা নিয়ে। নতুন এই সংস্থার লক্ষ্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে : "সংস্থাটির লক্ষ্য হলো কম্যুনিস্ট পার্টির অ-আমলাতান্ত্রীকরণ (de-bureaucratise) করা, এর বৈপ্লবিক ইচ্ছাকে পুনর্জাগরিত করা এবং সাধারণভাবে ফরাসী রাজনীতিকে মার্কিন-মুখী অথবা সোভিয়েত-মুখী না করে 'তৃতীয় পথ-অভিমুখী' করে তোলা। এর উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা এবং ফ্রান্সকে অ-স্তালিনীয় সমাজতন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা।"[১০] সার্ত্‌র্‌ চেয়েছিলেন এই সংস্থার মাধ্যমেই তাঁর চিন্তা ও কর্মের মধ্যে, তাঁর লেখক-সত্তা ও কর্মী-সত্তার মধ্যে, সংহতি আনতে। বিপ্লব এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাস তখন সার্ত্‌র্‌-এর মূল প্রেরণা। "কিন্তু সংস্থাটির প্রত্যয়গুলি ছিল যথেষ্ট অপরিণত (naive), কেননা, এগুলির সংগে ফরাসী-জীবনের কোন শক্তি বা শ্রেণীর সম্পর্ক ছিল না।"[১১] ১৯৪৮-এ সার্ত্‌র্‌ রুসে এবং রোজাঁতাল-এর সংগে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত রইলেন। এই আলাপ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো, নাম Entreteins Sur la politique। ঐ গ্রন্থে (যা সংস্থার ম্যানিফেস্টো) সার্ত্‌র্‌ বাস্তব রাজনৈতিক আন্দোলন ও ক্রিয়াকাণ্ডের সংগে সম্পর্কিত করে অস্তিবাদ ও 'মার্কস্‌বাদের মধ্যে সমন্বয়ের কথা প্রচার করেন। ধারণাগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন সার্ত্‌র্‌ এবং অন্যান্য সদস্যগণ। কিন্তু সদস্যগণের অতি উৎসাহ এবং শ্রমিক শ্রেণীর সমর্থন না পাওয়ার ফলে সংস্থাটি এমন জায়গায় পৌঁছাল যাকে 'সাম্যবাদ-বিরোধী' ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। সংস্থাটির বুদ্ধিজীবী-প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ মতবিরোধও প্রকট হয়ে উঠেছিল।

৯. **Ronald Aronson, J. P. Sartre, Philosophy in the World.**
১০. **Mark Poster, Existential Marxism in Post-War France.**
১১. **Ronald Aronson, J. P. Sartre, Philosophy in the World.**

সার্ত্‌র্‌ অবিলম্বে সদস্যপদ ত্যাগ করে সংস্থার সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। তাঁর কাছে সাম্যবাদ-বিরোধী ক্রিয়াকলাপ ছিল ঘৃণ্য, অমার্জনীয় অপরাধ। রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতাকেই সার্ত্‌র্‌ এই 'ব্যর্থতার' জন্য দায়ী করেছেন। তারপর নিজের চেষ্টায় ধীরে ধীরে ফ্রান্সের কম্যুনিষ্টদের বন্ধু-সহযাত্রী হিসেবে অনেকটা কাছাকাছি চলে আসার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু ১৯৫০-এ মার্লো পঁতির সংগে সোভিয়েত কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পের বিরুদ্ধে সার্ত্‌র্‌ তীব্র প্রতিবাদ জানালে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ১৯৫২-তে ফরাসী সরকার কম্যুনিস্টদের ওপর আক্রমণ শুরু করে এবং ২৮শে মে কয়েকজন কম্যুনিস্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করে। সার্ত্‌র্‌ কম্যুনিস্টদের পক্ষ অবলম্বন করলেন এবং সরকারের দমননীতির প্রতিবাদ জানালেন। ঐ বছরই প্রকাশ করলেন 'কম্যুনিস্ট অ্যাণ্ড দ্য পিস্‌' নামক একটি প্রবন্ধ সংকলন। সরকারী দমননীতির প্রতি তাঁর বিক্ষুব্ধ মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে সার্ত্‌র্‌ ঐ রচনায় বলেছেন যে, সরকারের নোংরা ছেলেমানুষি কৌশল তাঁর বমির উদ্রেক করে, কম্যুনিস্ট বিরোধী এক ঘৃণ্য জন্তু। গ্রন্থটিতে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নকে শান্তির সংগে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধের সংগে বন্ধনীভুক্ত করলেন। গ্রন্থটিতে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টি প্রলেতারিয়েতকে নিষ্ক্রিয়তা থেকে মুক্ত করেছে। সার্ত্‌র্‌ কম্যুনিস্ট পার্টিকে শ্রমিক শ্রেণীর যথার্থ আত্ম-প্রকাশ বলে বর্ণনা করেছেন এবং অংশতও পার্টির বিরোধিতাকে 'সর্বহারা-শ্রেণীর প্রতি শত্রুতা, মানবতাবাদের প্রতি শত্রুতা এবং যুদ্ধবাদী সাম্রাজ্যবাদের দালালী বলে চিহ্নিত করেছেন। ঐ বছর সার্ত্‌র্‌ ভিয়েনায় বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগ দিয়ে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের মূল ধারার সংগে নিজেকে যুক্ত করলেন। "কম্যুনিস্টরাও সার্ত্‌র্‌কে স্বাগত জানালেন। কানাপা সার্ত্‌র্‌-এর মনোভাব ও ক্রিয়াকলাপকে 'সাহসী' ও 'বন্ধুত্বপূর্ণ' বলে চিহ্নিত করলেন।" ঐ সময় সার্ত্‌র্‌-কে দেখা যেতে লাগল বামপন্থী মিছিলে, সমাবেশে,—জনগণের সংগী হিসাবে।

সার্ত্‌র্‌ একথা বিশ্বাস করতেন যে, কম্যুনিস্ট পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর ভরসাস্থল ও সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। তাঁর মতে পার্টির মাধ্যমেই শ্রমিকশ্রেণী ইতিহাসের বিষয়ী হয়ে উঠতে পারে। ১৯৫৪-তে সার্ত্‌র্‌ বার্লিনে বিশ্বশান্তি কমিটির অধিবেশনে যোগদান করেন এবং প্রথমবার সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ করেন। ফ্রান্স-সোভিয়েত সংঘের সহসভাপতিও মনোনীত হন ঐ বছরে। ১৯৫৫-তে সার্ত্‌র্‌ হেল্‌সিংকিতে

বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সম্মেলনে যোগদান করেন এবং চীন পরিভ্রমণ করেন। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামকে সামরিক শক্তির সাহায্যে দমন করার চেষ্টা করলে সার্ত্‌র্‌ এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। ঐ বছর ফরাসী নির্বাচনে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের জয় ঘোষিত হয়। সার্ত্‌র্‌ তাঁর কেন্দ্রের কম্যুনিস্ট প্রার্থীকে ভোট দিয়েছিলেন। সুয়েজে ফরাসী-ইংরেজ-ইজরায়েলীয় হস্তক্ষেপের বিরোধিতাও করেন তিনি ঐ বছরে। কিন্তু ঐ বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ। সার্ত্‌র্‌ বিনা দ্বিধায় এই হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানান এবং সোভিয়েত হস্তক্ষেপের নিন্দা করেন। সমাজতন্ত্রের নামে এই হস্তক্ষেপকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। স্বভাবতই কম্যুনিস্টদের বন্ধু-সহযাত্রী হিসেবে বিগত চার-পাঁচ বছরের সগর্ব পথ-চলার গতি গেল কিছুটা থেমে। কম্যুনিস্ট পার্টি এবং ফ্রান্স-সোভিয়েত সংঘের সংগে ঘটল সম্পর্কচ্ছেদ। ঐ সময়েই তিনি রচনা করেন 'ল্য ফঁতোম দ্য স্তালিন' বা 'ঘোস্ট অব্‌ স্তালিন'। রচনাটিতে তিনি হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের সামাজিক-ঐতিহাসিক দিকটির বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে অ-স্তালিনীকরণ (de-Stalinization) একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ। পঞ্চাশের দশকে সার্ত্‌র্‌-এর রাজনৈতিক কর্মপন্থাই ছিল এক একটি ঘটনার প্রতিবাদের অভিযান চালানো বা সেই অভিযানে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ। এ ভাবেই তিনি বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাকে আঘাত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক কর্মপন্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল 'লে তঁ মদান'' পত্রিকার সম্পাদকীয় রচনায় উচ্চারিত প্রতিবাদ, ঐ পত্রিকায় প্রবন্ধের মাধ্যমে জনমনকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা, সভায় বা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ, নানা ধরনের বিবৃতি প্রচার, সমবেত বিবৃতি ও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান, বিভিন্ন দেশের মুক্তি আন্দোলন সমর্থন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

আলজিরিয়ার মুক্তিযুদ্ধে ফরাসী ভূমিকার প্রতিবাদে ইশতেহার বিলি করার অপরাধে কারারুদ্ধ সৈনিক অঁরি মারতঁ্যার মুক্তির দাবী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রোজেনবার্গ দম্পতির হত্যার তীব্র নিন্দা, ফরাসী সাংবাদিক অঁরি আলেগ্‌-এর ওপর ফরাসী সৈনিকদের বর্বর অত্যাচারের কাহিনী উদ্‌ঘাটন ও তার নিন্দা, আলজিরীয়-কিশোরী জামিলা বুপাশার ওপর অকথ্য নির্যাতনের সংগে জড়িত ফরাসী অফিসারদের শাস্তি দাবী, আলজিরীয় জাতীয়তাবাদীদের সংগে গোপন আঁতাতের জন্য ফ্রাঁসিস জঁস-এর কারাদণ্ডের প্রতিবাদে আন্দোলন..

ইত্যাদির পেছনে রয়েছে সার্ত্র্-এর মানবদরদী মন, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং স্বাধীনতা রক্ষার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

১৯৫৭-তে সার্ত্র্ পোলান্ড পরিভ্রমণ করেন। পরের বছর আলজিরিয়ার ফরাসী সরকারের দমননীতি ও পীড়নের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। ১৯৬০ সালে সার্ত্র্ কিউবা ভ্রমণে যান। ফিডেল কাস্ত্রোর সংগে সাক্ষাৎ ও আলোচনার ফলে অচিরেই গড়ে উঠে সখ্যতা। চে গুয়েভারার সংগেও সার্ত্র্ সাক্ষাৎ ক'রে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। আলজিরিয়ায় ফরাসী সরকারের যুদ্ধ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সার্ত্র্ '১২১ জনের ঘোষণাপত্র'-এ স্বাক্ষর করেন। ঐ বছর যুগোশ্লাভিয়া পরিভ্রমণে গেলে মার্শাল টিটো সার্ত্র্-কে সাদর অভ্যর্থনা জানান। ঐ বছরেই প্রকাশিত হয় তাঁর বহুবিতর্কিত গ্রন্থ 'দ্য ক্রিটিক অব্ ডায়েলেকটিক্যাল রীজন'। গ্রন্থটিতে সার্ত্র্ সমাজতন্ত্র ও স্বাধীনতার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে তৈরি করার চেষ্টা করেছেন অস্তিবাদী মার্কস্‌বাদ। ১৯৬০-তে আলজিরিয়ার যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন সার্ত্র্। তারপর গারোদির সংগে দ্বন্দ্ববাদ নিয়ে বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন এবং রোমের গ্রাম্‌চি ইন্‌স্টিট্যুটে 'রহস্যবাদ ও মার্কস্‌বাদ' সম্পর্কে বক্তৃতা দান করেন।

১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্ তাঁর আজীবন সঙ্গিনী সিমোন দ্য বোভয়রকে সংগে নিয়ে রাশিয়া যান এবং রাশিয়ান লেখকদের সংগে মিলিত হন। সোভিয়েত নেতা ক্রুশ্চেভ তখন সার্ত্র্-কে সাদর অভ্যর্থনা জানান। প্রসংগত স্মরণ করা যেতে পারে যে, ক্রুশ্চেভ এর আগে স্তালিনবাদ ও ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সরাসরি পার্টি কংগ্রেসে তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন। ফ্রান্সে ফিরে এসে সার্ত্র্ শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে বিশ্ব সম্মেলনে অংশ গ্রহণের জন্য আবার সোভিয়েত ইউনিয়ন যান। ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্ তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু ইতালীয় কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা পালমিরো তেগোলিয়াত্তির স্মরণে একটি রচনা প্রকাশ করেন, এবং 'নীতি ও সমাজ' সম্পর্কে গ্রাম্‌চি ইন্‌স্টিট্যুটে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। ১৯৬৫-তে হেল্‌সিংকিতে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন সার্ত্র্। ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে দার্শনিক এবং শান্তিবাদী বার্ট্রান্ড রাসেলের আহবানে তিনি ভিয়েৎনাম যুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে বিচারসভায় সভাপতিত্ব করতে স্বীকৃত হন এবং পরের বছর আমেরিকাকে ভিয়েৎনামের গণহত্যার জন্য অভিযুক্ত করেন।

১৯৪৪-এ প্যারিস মুক্তির পর ফ্রান্সের অভ্যন্তরস্থ সব চেয়ে বড়ো রাজনৈতিক আলোড়ন হলো ১৯৫৮-এর ছাত্র-বিদ্রোহ। শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং জেনারেল দ্য'গলের দক্ষিণপন্থী সরকারের বিরুদ্ধে ছিল ছাত্রদের তীব্র অসন্তোষ। প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ছাত্ররা তৈরি করল ব্যারিকেড। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চলল দিনের পর দিন প্রকাশ্য বিক্ষোভ। ছাত্ররা হাত মিলিয়েছিল র‍্যাডিকেল ঐতিহ্যসম্পন্ন শ্রমিকদের সংগে। শ্রমিকরা ছাত্রদের সমর্থন জানালো। একযোগে তারা সমাজতান্ত্রিক কর্মনীতি ও সমাজসংস্কারের জন্য দাবী জানালো, যেগুলির মধ্যে ছিল সেই সব সাম্যবাদী ধারণার প্রতিধ্বনি, সার্ত্‌র্ যেগুলির পক্ষে অনেকদিন ধরেই প্রচার চালিয়েছিলেন। ছাত্র এবং শ্রমিকগণ চাইছিল তাদের নিজেদের ভাগ্যের নিয়ন্তা হতে পারার ক্ষমতা। ওরা দাবী করেছিল যে, ওরা কী পালন করবে তা ওরা নিজেরাই ঠিক করবে। স্বভাবতই সার্ত্‌র্ তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও স্বাধীনতার দাবীকে সমর্থন জানান। শুধু তাই নয়। সর্‌বোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্রোহী ছাত্রদের সংগে তাদের আন্দোলন ও কর্মপন্থা নিয়ে বৈঠকও করেন এবং রেডিও-তে ছাত্র-বিদ্রোহের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে ফরাসী পুলিশের দমননীতির তীব্র নিন্দা করেন। কোন কোন মাওবাদী সংস্থা সার্ত্‌র্-এর নাম ব্যবহার করা সত্ত্বেও তিনি আপত্তি জানান নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৩৪ জন বিদ্রোহী ছাত্রকে বহিষ্কার করলে সার্ত্‌র্ তীব্র প্রতিবাদ জানান।

রেজিস্ দব্‌রে-র মুক্তির দাবীতে এবং চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত দমননীতি ও সল্‌ঝেনিৎসিন্‌কে সোভিয়েত লেখসংঘ থেকে বহিষ্কারের দাবীতেও সার্ত্‌র্-কে আমরা সরব হতে দেখি। বস্তুত ১৯৫৮ সালের ছাত্র-বিদ্রোহের ফলে যে রাজনৈতিক ঝড় ফ্রান্সে দেখা দিয়েছিল তা সার্ত্‌র্-কে গভীরভাবে স্পর্শ করে। বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নিয়ে তিনি নতুন করে ভাবতে শুরু করেছিলেন। জাত বুদ্ধিজীবীদের (classical intellectual) বদলে তিনি চেয়েছিলেন নব্য-বুদ্ধিজীবীদের (Neo intellectual), যাঁরা জনগণের সংগে সংশ্লিষ্ট হতে আগ্রহী এবং যাঁদের দ্বারা যথার্থ সর্বজনীনতা আনা সম্ভব। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে সার্ত্‌র্ 'র‍্যাঁতারলুৎ' নামক বুলেটিনের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, যা সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। এরপর সার্ত্‌র্ যুক্ত হন 'লা কোজ দু প্যপ্‌ল্' নামক একটি বামপন্থী পত্রিকার সংগে। সার্ত্‌র্, বোভয়র, জাঁ লুক গোদার প্রমুখ কর্মীরা সহর্ষচিত্তে সেই পত্রিকা রাস্তায় বিক্রি করতেন। ফ্রান্সে শ্রমিকরা যে আন্দোলন করছিল সে সম্পর্কে জনগণকে

অবহিত করা ছিল পত্রিকাটির অন্যতম উদ্দেশ্য। সরকার-বিরোধী ক্রিয়া-কলাপের জন্য দুজন সম্পাদক ল্য ব্রি এবং ল্য দাঁতেক-কে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রতিবাদে ৫০০০ লোকের বিক্ষোভ মিছিল শহরের পথ পরিক্রমা করে। সকলের অনুরোধে তখন সার্ত্র্ পত্রিকাটির সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে* সার্ত্র্ 'সেক্যুর রুজ' নামে একটি সংগঠন তৈরি করতে সচেষ্ট হন। প্রধান প্রধান বামপন্থী গোষ্ঠীগুলি ঐ সংগঠনের সদস্য হয়। মাত্রাতিরিক্তভাবেই ঐ সময় সার্ত্র্ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। 'সেক্যুর রুজ্'-এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচার ও দমননীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। ঐ বছরই লাইন্‌হার, গ্লক্‌স্‌মান, ক্রমাঁজে, গোদার প্রমুখ বামপন্থী সুহৃদদের নিয়ে সার্ত্র্ প্রকাশ করলেন 'জাক্যুজ' নামে একটি নতুন পত্রিকা। কিছুদিন পর পত্রিকাটি 'লা কোজ দু প্যপ্ল্'-এর সংগে সংযুক্ত হয়ে যায়। নতুন নাম হয় 'লা কোজ দু প্যপ্ল্—জাক্যুজ'। সার্ত্র্ ঐ বছরে আরো দুটি বামপন্থী পত্রিকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর একটি হলো 'তু' এবং অন্যটি 'লা প্যারোল দু প্যপ্ল্'। সত্তরের দশকে অনেক মাওবাদী তরুণ কর্মীদের সংগে সার্ত্র্ আলাপ-আলোচনা করেছেন নানা বিষয় নিয়ে। একসময় 'সেক্যুর রুজ'-এর পরিচালন সমিতি থেকে সার্ত্র্ নিজেকে সরিয়ে আনেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, মাওবাদীরা পরিচালন সমিতিতে বড় বেশী 'ক্ষমতাপ্রিয়' হয়ে উঠেছে। ১৯৫১-এর মে মাসে-কিউবার বিখ্যাত কবি ও লেখক পাদিলার গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে ফিদেল কাস্ত্রোর কাছে প্রতিবাদ পত্র পাঠান। জুন মাসে মরিস ক্লাভের-এর সংগে 'লিবারেশন প্রেস এজেন্সি' নামে একটি সংস্থা তৈরি করে সংস্থার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে সার্ত্র্ লিখেছেন, "এটি জনগণকে দেবে কথা বলার অধিকার, তার সাংবাদিকদের দেবে লেখার অধিকার।"

১৯৫২-এ মিশেল মাসো রচিত গ্রন্থ 'লে মাও এ ফ্রাঁসো'-এর মুখবন্ধে মাওবাদীদের সংগে তাঁর সখ্যতা ও ঐক্যবদ্ধতার কারণ বিশ্লেষণ করে লিখে-ছিলেন, "স্বতস্ফূর্ততার প্রতি মাওবাদীদের শ্রদ্ধার অর্থ হলো, বৈপ্লবিক চিন্তার উৎস জনগণ, এবং কর্মের দ্বারা একমাত্র জনগণই পারে বিপ্লবকে

এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং বিকশিত করতে।"[১৩] তাছাড়া, মাওবাদীরা নীতি-শাস্ত্র ও রাজনীতির মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরি করেছিলেন। সার্ত্র্‌ও এ বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, তিনি নিজেকে গণকর্মের স্তরে নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেছেন যে, 'বর্তমানে সর্বত্রই নৈতিকতার প্রশ্ন, এবং নৈতিকতার প্রশ্ন রাজনৈতিক প্রশ্ন ছাড়া আর কিছু নয়, আর এখানেই আমি আমার মাওবাদী বন্ধুদের সংগে একমত।"[১৪] ঐ বছরই নভেম্বর মাসে সার্ত্র্‌ মাওবাদী কর্মী পিয়ের ভিক্‌তর্‌ * এবং ফিলিপে গাভির সংগে 'লিবেরাসিয়োঁ' নামে নতুন একটি পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৩-এর ২১শে মে সার্ত্র্‌-এর পরিচালনায় পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ঐ সময় সার্ত্র্‌ বেশীর ভাগ সময় ব্যস্ত থাকতেন ভিক্‌তর্‌ ও গাভির সংগে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায়। অবশ্য তাতে তাঁর অন্যান্য কাজকর্ম ব্যাহত হতো না।

১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্র্‌ তাঁর দর্শন ও রাজনীতি নিয়ে ছাত্রদের সংগে দীর্ঘ আলোচনা করেন। মিশেল কঁতা তা লিপিবদ্ধ করেন এবং ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে তা জাপানের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৭৫-এ সার্ত্র্‌ নিজেকে 'স্বাধীনতার পক্ষপাতী সমাজতন্ত্র'-এর সমর্থক বলে বর্ণনা করেন। বার্ধক্যজনিত অবসাদ ও নানা অক্ষমতা সত্ত্বেও সার্ত্র্‌ রাজনৈতিকভাবে তখনও সক্রিয় ছিলেন। ঐ বছর তিনি প্রকাশ করেন 'ওয়ান ইজ রাইট ইন্‌ রিভল্টিং' নামক একটি বিতর্কমূলক রাজনৈতিক রচনা। সার্ত্র্‌-এর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর এবং নির্ভীক রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে দক্ষিণপন্থীরা কখনই সন্তুষ্ট ছিল না। তাঁর প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে দক্ষিণপন্থী সন্ত্রাস-বাদী গোষ্ঠী জি. আই. এন. ১৯৭৭-এর ১লা ডিসেম্বর একটি চিঠি পাঠায়। সার্ত্র্‌-এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হলেও তিনি ছিলেন নির্ভীকচিত্ত ও সম্পূর্ণ শান্ত।

১৯৭৭-এর জুন মাসে সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভ-কে যখন রাষ্ট্রপতির এলিজে প্রাসাদে সরকারী সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছিল, সার্ত্র্‌ তখন অন্যান্য বুদ্ধিজীবী ও বামপন্থী কর্মীদের সংগে রিসাইমা থিয়েটারে পূর্ব ইউরোপের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সদস্যদের অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর সার্ত্র্‌ বেড়াতে গেলেন রোমে। রোমে থাকাকালীন বোলাঞা শহরে একজন ছাত্র পুলিশের

১৩. **Simone de Beauvoir, Adieu, A Farwell to Sartre.**

১৪. ঐ

* আসল নাম বেনি লেভি। জাতিতে মিশরীয় ইহুদী।

গুলিতে নিহত হলে আন্দোলন শুরু হয়। সার্ত্‌র্‌ তাতে শুধু সামিলই হন নি, প্রতিবাদ জানিয়ে ঘোষণাপত্রে সই করে ও কাগজে সাক্ষাৎকার দিয়ে ঐ আন্দোলনের পক্ষে তাঁর মত প্রকাশ করেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "যখনই সংগ্রামী কোন তরুণের দিকে পুলিশের গুলি ছুটে আসবে, আমি তখনই সেই তরুণের পাশে থাকব...।"[১৫] এ ছাড়া, ঐ সময় সার্ত্‌র্‌ দেশ-বিদেশের নানা রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সংগেও নিজেকে কোন না কোনভাবে যুক্ত রেখেছিলেন।

১৯৫৮-এ সার্ত্‌র্‌ ভিক্‌তর্‌-এর সংগে 'পুভয়া এ লিব্যের্তে' নামক গ্রন্থ রচনায় অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মাওবাদী ঐ বুদ্ধিজীবী তরুণের সংগে বইটি লেখার ব্যাপারে সার্ত্‌র্‌ তাঁর মনোভাব সম্পর্কে মিশেল সিকার-কে এক সময় বলেছিলেন, "এই বইটি যদি লক্ষ্য অনুযায়ী শেষ হয়, তাহলে সেখানে পাওয়া যাবে দুজন ভিন্ন ব্যক্তির চিন্তা ভাবনার ফসল। এখানে মতের ঐক্য যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে পারস্পরিক বিরোধ। এই বই-এ বিরোধের মধ্য দিয়েই অনুভব করা যাবে জীবনকে।"[১৬] ঐ বছর অক্টোবর মাসে সার্ত্‌র্‌ লারজাক্‌-এর কৃষক সম্পদায়ের এক প্রতিনিধি দলের সংগে মিলিত হন এবং কৃষকদের সরকার-বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করে বিবৃতি দেন। ইতোমধ্যে ভিক্‌তর্‌-এর ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে 'লে তঁ মদার্ন'-এর অনেক সদস্যই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। বোভয়র-এর ডায়েরী থেকে জানা যায় যে, সার্ত্‌র্‌-এর বার্ধক্যজনিত অবসাদ ও অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে ভিক্‌তর্‌ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সার্ত্‌র্‌-এর মুখ দিয়ে অনেক কথাই বলিয়ে নিয়েছেন যা বস্তুত সার্ত্‌র্‌-এর বক্তব্য নয়। ভিক্‌তর্‌ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সাক্ষাৎকার নিতেন এবং সার্ত্‌র্‌-কে সব দিক ভাবনা-চিন্তা করে মতামত প্রকাশের সুযোগ না দিয়ে চাপের মুখে তিনি অনেক কথাই সার্ত্‌র্‌-কে দিয়ে বলিয়েছেন। এসব সাক্ষাৎকার প্রকাশের জন্য তৈরি করা হলেও প্রায়ান্ধ সার্ত্‌র্‌ তা সব ক্ষেত্রে শুধরে নিতে পারেন নি। ফলে বিকৃত অবস্থায় 'সার্ত্‌র্‌-ভিক্‌তর্‌ আলাপ' যখন প্রকাশিত হলো, সার্ত্‌র্‌ তখন অত্যন্ত বিমর্ষ ও ব্যথিত, আর বোভয়র এবং সার্ত্‌র্‌-অনুরাগীরা আতঙ্কিত।

১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে সার্ত্‌র্‌ ভিয়েৎনামীয় উদ্বাস্তুদের প্রতি সক্রিয় সমর্থন জানান এবং 'অঁ বাতো পুর ল্য ভিয়েৎনাম' নামক সমিতির জুন মাসের সভায়

১৫. **Simone de Beauvoir, Adieu, A Farewell to Sartre.**
১৬. ঐ

শারীরিক অসুস্থতা ও অক্ষমতা নিয়েও সাগ্রহে যোগদান করেন। সেপ্টেম্বর মাসে যোগ দিয়েছিলেন নিহত পিয়ের গোল্‌দ্‌মান্‌-এর অন্ত্যেষ্টিতে। ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দে ১৬ই এপ্রিল সমাজতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক, এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক সার্ত্‌র্‌ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর নিষ্ঠা, সাহস, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং দায়িত্ববোধ ও অঙ্গীকারবদ্ধতা ছিল অতুলনীয়।

সার্ত্‌র্‌-এর রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এবং তাঁর 'ক্রিটিক' গ্রন্থটির উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু সযত্নে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, সার্ত্‌র্‌ মার্কস্‌বাদকে কোনদিনই বর্জন করেন নি। বরং মার্কস্‌বাদই ছিল তাঁর পথ-নির্দেশক। একথা অবশ্যই স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, সার্ত্‌র বহুমাত্রিক সামাজিক অভিজ্ঞতাকে (multidimensional Social experience) গুরুত্ব দিয়েছেন। জীবনের নানা মাত্রা আছে। মানুষকে তিনি তাই শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন নি। গোঁড়া মার্কসীয় অর্থনীতি নয়, বরং নৈতিক কারণেই সার্ত্‌র্‌ মার্কস্‌বাদকে গ্রহণ করেছেন। অস্তিবাদী মার্কস্‌বাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, ১৯৫৮-এর মে মাসের ঘটনাবলী সার্ত্‌র-কে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিয়েছিল যে, গোষ্ঠীর মধ্যেই রয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায়। একথা তাঁর কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয়েছিল যে, অ-আনবিক (non-atomistic) সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। নৈর্ব্যক্তিকতা, বিচ্ছিন্নতা, আনবিকীকরণ ইত্যাদি, যা অনুক্রম (Series) বা যান্ত্রিক সংঘবদ্ধতার প্রলক্ষণ, গোষ্ঠীর আঙ্গিক সংঘবদ্ধতার দ্বারা দূরীভূত হয়ে যায়। 'সিরিজ' বা অনুক্রমে জোট বাঁধার ব্যাপারটি থাকে না। গোষ্ঠীতে পাওয়া যায় গভীর ব্যক্তিক সম্পর্ক, যা ছিল সার্ত্‌র্‌-এর অন্বিষ্ট। সার্ত্‌র্‌ মনে করতেন যে, অ-আনবিক সম্পর্ক আন্তব্যক্তিক প্রাক্সিসের ওপর নির্ভরশীল। সার্ত্‌র্‌-এর কাছে দ্বান্দ্বিকতা নিয়ন্ত্রণবাদ নয়। মানুষ দ্বান্দ্বিকতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, কেননা, দ্বান্দ্বিকভাবেই মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করে। সার্ত্‌র্‌ চেয়েছেন বিচারমূলক অভিজ্ঞতার (critical experience) সাহায্যে দ্বান্দ্বিকতার মূল্য প্রতিষ্ঠা করতে, যা দ্বান্দ্বিক জ্ঞানের সীমা নির্ধারণ করবে। সার্ত্‌র্‌-এর কাছে দ্বান্দ্বিকতা একই সংগে চিন্তার পদ্ধতি এবং বাস্তব সত্তার (reality) গঠন (structure)। বুদ্ধি এবং জ্ঞানের বিষয় বা বস্তু উভয়েই গতিশীল এবং একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল।

সার্ত্‌র্‌-এর 'ক্রিটিক' গ্রন্থটির মূল সুর অর্থনৈতিক নয়, সমাজবিজ্ঞানমূলক। তিনি মানুষকে 'উৎপাদন-সম্পর্ক'-এর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে

চাননি বলেই 'বহুমাত্রিক সম্পর্ক'-এর কথা বলেছেন। জীবনের শেষ দিকে বুদ্ধিজীবীদের সংগে গণ-আন্দোলনের সম্পর্ক বিষয়ে উৎসাহিত হতে আমরা সার্ত্র্-কে দেখেছি, আর বস্তুত তা 'মে মাসের ঘটনাবলী'র পর থেকেই। তিনি নিজেই বলেছেন, "১৯৬৮-এর মে মাসের ঘটনাবলী ঘটল, আমি বুঝতে পারলাম ছাত্র-যুবক-শ্রমিকরা যে প্রশ্ন তুলেছে তা নিছক পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ বা কোন সিস্টেম সম্পর্কে নয়। নূতন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে। ১৯৪০ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত আমি ছিলাম বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, আর ১৯৬৮ থেকে আমি হয়ে গেলাম বুদ্ধিজীবী বামপন্থী। পার্থক্য শুধু কর্মের···।"[১৭] সার্ত্র্-এর কাছে জীবনধারণ করার অর্থ হলো জগৎ-কে পরিবর্তিত করার কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করা। তাঁর রাজনৈতিক রচনাগুলিতেও দেখা যায় যে, তিনি নিছক বিশ্লেষণের গণ্ডীর বাইরে পা বাড়িয়েছেন এবং প্রয়োজনবোধে 'পক্ষ' অবলম্বন করেছেন।

সার্ত্র্ চেয়েছিলেন 'ইউরোপীয়ান ফেডারেশন', যা হবে দুই বৃহৎ শক্তি-নিরপেক্ষ; তবে এই ফেডারেশন সোভিয়েত নীতিগুলিরই কাছাকাছি থাকবে, আমেরিকার নয়। কম্যুনিস্টদের কিছু কিছু ক্রিয়াকলাপ সার্ত্র্-এর পছন্দ না হলেও সমাজতন্ত্রে তাঁর বিশ্বাসে কোনদিন চিড় ধরে নি। মানুষ যাতে খোলা মনে, খোলা হাতে চিন্তা ও কাজ করতে পারে, তার সুযোগ সার্ত্র্ বজায় রাখতে চেয়েছিলেন, আর তা চেয়েছিলেন মার্কসীয় কাঠামোর মধ্যেই। সমাজতন্ত্র মানুষের সৃষ্টি, সেহেতু একে বিরোধমুক্ত করার দায়িত্ব মানুষের। সার্ত্র্ মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, সমাজতন্ত্রের বাইরে গিয়ে মানুষের মংগল করা যায় না। মার্কস্-এর মতো সার্ত্র্ও মানবমুক্তির ঐকান্তিক আগ্রহে সমাজতন্ত্রের সাফল্য কামনা করেছেন। সমাজতন্ত্রই মানুষের ভবিতব্য —এটা ছিল সার্ত্র্-এরও দৃঢ় বিশ্বাস। মানুষের প্রতি অতন্দ্র ভালোবাসার জন্যই সার্ত্র্ রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। এই ভালোবাসা বা মানব-প্রেমের জন্যই তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন, বিশ্বের নানা ঘটনাবলী সাগ্রহে লক্ষ্য করেছেন, নিজের বিরুদ্ধে নিজে কলম ধরেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন তাঁর বিশ্বাসের শক্ত জমি। বাস্তব কর্মের দিক থেকে মার্কস্বাদের ইতিহাস-ব্যাখ্যায় সার্ত্র্-এর সমর্থন ছিল। অনবচ্ছিন্ন মানবপ্রেমের সূত্র ধরেই তিনি সমাজতন্ত্রে পৌঁছেছিলেন এবং সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে একমাত্র সমাজতন্ত্রেই মানবপ্রেম ও

১৭. **Mark Poster, Existential Marxism in Post-war France.**

স্বাধীনতা পূর্ণতা পেতে পারে। সার্ত্র্ চেয়েছিলেন সমাজতন্ত্রের হাত ধরে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে মানুষের স্বাধীনতা। এর বৈলক্ষণ্য যেখানেই দেখা গেছে সেখানেই শোনা গেছে তাঁর বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠ। সার্ত্র্ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার 'বড় প্রয়োজনের' কথা বলেছেন, আর তা হলো অ-আমলাতন্ত্রীকরণ, বিকেন্দ্রীকরণ এবং গণতন্ত্র। গোষ্ঠী ছাড়া ব্যক্তি যেমন পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে না, তেমনি ব্যক্তিকে মেরে গোষ্ঠী বাঁচতে পারে না—এটাই ছিল সার্ত্র্-এর দৃঢ় ধারণা। সর্বহারার বাপ্রলেতা-রিয়েতের নাম ভাঙিয়ে দলীয় আমলাতন্ত্র ও মুষ্টিমেয়ের শাসন সার্ত্র্ মানতে পারেন নি বলে তাঁকে 'মার্কস্‌বাদী' বলা যাবে না—এ যুক্তি অসার। কোন অবস্থাতেই সার্ত্র্-কে 'মার্কস্-বিরোধী' বা 'সাম্যবাদ-বিরোধী' বলে চিহ্নিত করা যাবে না। সার্ত্র্ কখনই মূল মার্কস্‌বাদের (basic Marxism) বিরোধী ছিলেন না। তিনি সেই মার্কস্‌বাদের বিরোধী যা অনড়, অচল, স্থির, অনগ্রসবমান--রেজিমেন্‌টেড। অবশ্য গোঁড়া মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে অনেকেই মার্কস্‌বাদ-বিরোধী বলে চিহ্নিত করেছেন। সার্ত্র্ নিজে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তই ঘোষণা করেন নি। রেমোঁ আরোঁ প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌গণ সার্ত্র্-এর চিন্তাধারার দ্বান্দ্বিক স্বরূপ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন বলেই সার্ত্র্-এর 'ক্রিটিক' গ্রন্থটিতে প্রণালীবিজ্ঞানগত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (methodological individualism) ছাড়া আর কিছু দেখতে পান নি। অথচ, সার্ত্র্ যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন তা হলো 'সমষ্টিগত দায়িত্ব' (collective responsibility)। যে কোন সামাজিক মতবাদের মূল সমস্যা হলো ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক কী, তা ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা। সার্ত্র্ এ ক্ষেত্রে যে 'হাতিয়ার' ব্যবহার করেছেন তা হলো 'সমষ্টিগত দায়িত্ব।' সেজন্যই আমরা দেখি সার্ত্র্-এর সনিষ্ঠ অনুসন্ধানের বিষয় ব্যক্তি মাত্র নয়, সম্পর্কে-আবদ্ধ ব্যক্তি (individuals-in-relation)—অনেকটা মার্কস্-উল্লিখিত 'সামাজিক ব্যক্তি'-র (social individuals) মতো। রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে সার্ত্র্ সমসাময়িক ঘটনাবলীর যখন বিশ্লেষণ করেছেন, তখন তাঁর বিশ্লেষণের পদ্ধতি যে 'মার্কসীয়' ছিল তাতে সন্দেহ নেই। "সার্ত্র্ নিজেও বলেছেন যে, ইন্দো-চীন, আলজিরিয়া, মার্কিন রাজনীতি বা নিগ্রো সমস্যা নিয়ে তিনি যে সমস্ত রচনা প্রকাশ করেছেন, সেইসব রচনার পদ্ধতি এবং কর্মের ক্ষেত্রে তাঁর আচরণ মূলত মার্কসীয়।"[১৮]

---

১৮. **R. M. Alberes, Jean-Paul Sartre : Philosopher without Faith.**

সার্ত্র্-এর চিন্তাভাবনার মার্কসীয় রূপান্তরকে কোন অবস্থাতেই তাঁর 'স্বকীয়তার বিক্রয়' রূপে চিহ্নিত করা সংগত নয়। অ্যানার্কো-সিন্ডিকেলিস্ট্ হিসাবেও তাঁকে চিহ্নিত করা সমর্থনযোগ্য নয়। সার্ত্র্-এর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় অসংগতি থাকতেই পারে। কিন্তু "গোঁড়া মার্কস্বাদ এবং রিডাক্সনিস্ট ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের চেয়ে তাঁর মতবাদ নিঃসন্দেহে উন্নততর, এবং এর মূল কারণ নিহিত আছে নৈতিকভাবে দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে সার্ত্র্ সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি।"[১৯] অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ নয়, সমষ্টিগত বিষয়ীই (Collective Subject), লুসিয়াঁ গোল্দ্মান-এর মতে, মার্কস্বাদের সংজ্ঞাপ্রদায়ক বৈশিষ্ট্য। অস্তিবাদীর বক্তব্য হলো, ব্যক্তিই প্রধান, আর •মার্কস্বাদী বলেন, নৈর্ব্যক্তিক শক্তি (impersonal forces) এবং সম্পর্কসমূহ মানবজাতির অনন্বয়ের জন্য দায়ী। সার্ত্র্ .সমষ্টিগত দায়িত্বের একটি মতবাদ তৈরির মাধ্যমে ঐ দুই দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্রিত করে একটি সামাজিক মতবাদ জগৎবাসীকে উপহার দিয়েছেন। বস্তুত, সার্ত্র্-এর সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা এবং কর্মকাণ্ডের দিক থেকে বিচার করলে সার্ত্র্-কে আমরা 'মার্কস্বাদী' হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি, তবে সেই চিহ্নিতকরণ প্রথানুযায়ী নয়। রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্ হিসেবে সার্ত্র্-এর ভাবনা এবং কর্মের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, সমাজতন্ত্রেই তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত মানবমুক্তির সন্ধান করেছেন। মার্কসীয় চিন্তাভাবনা সার্ত্র্ কখনই বর্জন করেন নি, কমিউনিজমের বিরোধিতার কথা স্বপ্নেও চিন্তা করেন নি। তবে, তিনি তাঁর অস্তিবাদী মার্কস্বাদ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, মানবিক উপলব্ধি নিজেকে কেন্দ্র করে হয় না, এর জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক একটি গোষ্ঠীর, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তিই স্বাধীন সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। মার্কস্বাদ সার্ত্র্-এর কাছে অনড়, অচল কোন মতবাদ নয়। তিনি ছিলেন স্থির ও অনগ্রসরমান মার্কস্বাদের বিরোধী। সমাজকেন্দ্রিক মার্কসীয় কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতার স্থান নির্ণয় করতে চেয়েছেন সার্ত্র্ তাঁর অস্তিবাদী মার্কস্বাদে। এই স্বাধীনতার জন্যই তিনি চেয়েছিলেন একটি গণতান্ত্রিক গোষ্ঠী। বুর্জোয়া ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ বর্জন করে সার্ত্র্ গ্রহণ করেছিলেন সমাজতন্ত্রকে। সমাজতন্ত্রের জন্য আপোষহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে মানুষের

১৯. **Thomas R. Flynn, Sartre and Marxist Existentialism.**

স্বাধীনতাকে রক্ষা করাই ছিল সার্ত্‌র্‌-এর লক্ষ্য। সার্ত্‌র্‌ মৃত্যুর আগে একথা ঘোষণা করেছেন যে, অ-আমলাতন্ত্রীকরণ, বিকেন্দ্রীকরণ এবং গণতন্ত্র হলো সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

সাম্প্রতিককালে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার নানা দেশে যে সমস্ত পরিবর্তন এবং পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাতে যেন সার্ত্‌র্‌-এর বক্তব্যেরই প্রতিফলন ঘটছে দেখা যাচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, পোলান্ড, রোমানিয়া, পূর্ব জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশে পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে। সে-সব দেশে সমাজতন্ত্রকে গণতন্ত্রের সংগে যুক্ত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। সমাজের গণতান্ত্রিক ভিত্তি শক্তিশালী করার জন্য, স্বশাসন গড়ে তোলার জন্য, আর পরিচালনার সর্বস্তরে খোলামেলা আলোচনা প্রসারিত করার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সমাজতন্ত্র, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের নীতির ভিত্তিতে কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য ব্যাকুলতা জনগণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে আরও মর্যাদা ও আত্মসম্মান, পরিকল্পনার গণতন্ত্রীকরণ এবং যৌথ উদ্যোগ ও মানবিকতার প্রতি লক্ষ্য করা গেছে জনগণের আগ্রহ। সর্বত্রই দাবী উঠছে—'মুক্ত সমাজ চাই', 'গণতন্ত্র চাই', 'আমূল সংস্কার চাই।' তাই বন্ধ সমাজের বাতায়ন উন্মুক্ত করে ছকে-বাঁধা বুলির জায়গায় নতুন ভাবনা-চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে সেই সব দেশের মানুষ। সমাজবাদী সমাজকে অনমনীয় এবং অপরিবর্তনীয় বলে মনে করা ভুল ও ক্ষতিকর—এ উপলব্ধি অনেক সমাজতান্ত্রিক সমাজেই আজ হয়েছে। এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা ভাবা বোধহয় খুব অসংগত হবে না যে, সার্ত্‌র্‌-এর সমাজতান্ত্রিক মানবিক মডেল ও অস্তিবাদী মার্ক্‌স্‌বাদ আধুনিক বিশ্ব-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় এবং একে গ্রহণ না করলেও উপেক্ষা করা সহজ নয়।

প্রাসংগিক গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

J. P. Sartre : *Being and Nothingness.*

: *Existentialism and Humanism.*

: *'Materialism and Revolution' in Literary and Philosophical Essays.*

: *Search for a Method.*

: *The Communtsts and Peace.*

: *The Ghost of Stalin.*

: *Situations.*

: *The Age of Reason;*

: *The Reprieve.*

: *Iron in the soul.*

: *Nausea.*

: *What is Literature ?*

: *Between Existentialism and Marxism.*

Simone de Beauvoir : *Force of Circumstances.*

: *Adieu, A Farewell to Sartre.*

Alfred J. Reiber : *Stalin and the French Communist Party, 1941-47.*

Lee and Mandelbaum : *Phenomenology & Existentialism.*

R. D. Cumming : *The Philosophy of Jean-Paul Sartre.*

Mark Poster : *Existential Marxism in Port-War France.*

Jean Hypolite : *Studies on Marx and Hegel.*

Wilfred Desan : *Marxism of Jean-Paul Sartre.*

Walter Odajnyk : *Marxism and Existentialism.*

James Sheridan : *Sartre The Radical Conversion.*

Ronald Aronson : *J. P Sartre Philosophy in the World.*

Philip Thody : *Jean Pau Sartre A Literary and Political Study.*

Andre Gorz : *Sartre and Marx.*

R. D. Laing and D. Cooper : *Reason and Violence : A decade in Sartre's Philosophy.*

Mary Warnock : *The Philosophy of Jean-Paul Sartre.*

Thomas R. Flynn : *Sartre & Marxist Existentialism.*
S. P. Verma : *Modern Political Theory : A Critical Survey.*
M. K. Bhadra : *Sartres Ontology of Consciousness.*
David Caute : *Communism and the French Intellectual.*
R. M. Alberes : *Jean-Paul Sartre Philosopher without Faith.*
Iris Murdoch : *Sartre Romantic Rationalist.*
Mark Poster : *Sartre's Marxism.*
Susobhan Sarkar : *Towards Marx.*
Karl Marx : *Selected works.*
: *Economic & Philosophic Manuscripts, 1844.*
V. I. Lenin : *Philosophical Note books.*
F. Engels : *Anti-Duhring.*
: *Dialectics of Nature.*
David McLellan : *Marx before Marxism.*
: *Marxism after Marx.*
: *The Thoughts of Karl Marx.*
Bottomore and Rubel : *Karl Marks Selected Writings in Sociology and Social Philosophy.*
Mary Warnock : *Existentialism.*
Marjori Grene : *Introduction to Existentialism.*
A. C. Danto : *Sartre.*
Action, 17 (Dec, 1944)
Aotion, 40 (June, 1945)
মৃণালকান্তি ভদ্র : জাঁ-পল সার্ত্র্‌ : সমাজতন্ত্র ও স্বাধীনতা, বিজ্ঞাপনপর্ব, চতুর্দশ বর্ষ, বিশেষ,সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৯৩ ।
অরুণ মিত্র : সার্ত্র্‌ ও তাঁর শেষ সংলাপ ।
সঞ্জীব ঘোষ : জাঁ-পল সার্ত্র : জীবন ও দর্শন ।
মৃণালকান্তি ভদ্র : অস্তিবাদ : জাঁ-পল সার্ত্র্‌-এর দর্শন ও সাহিত্য ।
সঞ্জীব ঘোষ : অস্তিবাদ : দর্শনে ও সাহিত্যে ।
[illegible]